মুরাদুল ইসলাম

গ্যাডফ্লাই



গ্যাডফ্লাই

মুরাদুল ইসলাম



--কৃতজ্ঞতা--

এই বই লেখতে গিয়ে বিভিন্ন তথ্যের জন্য কিংবা পরিস্থিতি বুঝার জন্য অনেক বই, ইন্টারনেটের বিভিন্ন আর্টিকেল, ডকুমেন্টারী ফিল্মের সাহায্য নেয়া হয়েছে। যেমন, ডিয়াগো ডি লান্ডার লেখা মায়াদের উপরে 'ইউকাটান বিফোর এন্ড আফটার দ্য কনকোয়েস্ট', চার্লস গ্যালেনক্যাম্প এর লেখা বই 'মায়াঃ দ্য রিডল এন্ড রিডিসকোভারি অফ এ লস্ট সিভিলাইজেশন, গবেষনা প্রবন্ধ "দ্য এরাইভাল অফ স্ট্রেঞ্জারসঃ টিওথোকান এন্ড থোলান ইন ক্ল্যাসিক মায়া হিস্টোরি লেখক ডেভিড স্টুয়ার্ট, যশোয়া জে মার্কের লেখা ইয়াশ কোক মো, মেসোওয়েব ডট কম ওয়েবসাইটে ইয়াশ কোক মো থেকে শুরু ওল্টার কিউ এ যে ষোলজন কোপান রাজার নাম আঁকা আছে তাদের অধিকাংশের বিষয়ে প্রবন্ধ। পিবিএস ডট অআরজি এর অসাধারন ডকুমেন্টারী 'দ্য লস্ট কিং অফ মায়া' এবং রাইজ এন্ড ফলঃ মায়ান সিভিলাইজেশন, সিক্রেট আর্কিওলজিঃ লস্ট সিটিজ অফ মায়া, হিস্টোরি ডকুমেন্টারী ফিল্মসঃ ফুল হিস্টোরী অফ হোয়াই দ্য মায়ান কালচার রিয়েলী ডিসেপিয়ারড ইত্যাদি ডকুমেন্টারী ফিল্ম মায়ানদের বুঝতে সাহায্য করেছে। যদিও এই বইয়ের কাহিনীতে বিশদে মায়ানদের বিষয়ে তেমন কিছুই লেখা

নেই, কিন্তু তবুও মায়ানদের ইতিহাস এবং স্প্যানিশদের আক্রমণের সময়কালের অবস্থা বুঝার জন্য বই এবং ডকুমেন্টারীগুলো ভূমিকা রেখেছে।

আরো সাহায্য নেয়া হয়েছে নাসিমা সেলিমের গবেষনা প্রবন্ধ "এন এক্সট্রাওর্ডিনারী ট্রুথঃ দি এডাম সুইসাইড নোট ফ্রম বাংলাদেশ, ব্লগার ইমন জুবায়েরের ব্লগ, অনিক আহসানের ব্লগ, প্রতুলচন্দ্র গুপ্তের লেখা বই ইতিহাসের গল্প, গবেষনা প্রবন্ধ মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অস্ত্র ও গ্যাসপ্রবাহ লেখক ভিলেম ভ্যান শেন্ডেল, অনুবাদ জোশিতা জিহান অর্নব, প্রপাগান্ডা ও গণমাধ্যমঃ যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশ- লেখক সামিয়া রহমান ও সৈয়দ মাহফুজুল হক থেকে।

দর্শন সম্পর্কে যেসব তথ্য আছে সেগুলোর তথ্যসূত্র- সোরেন কীয়েগার্ডের কন্সেপ্ট অব আয়রনি উইথ কন্টিন্যুয়াল রেফারেন্স টু সক্রেটিস, আলবেয়ার ক্যামুর এবসার্ড ফিলোসফির প্রবন্ধ মিথ অব সিসিফাস, ডক্টর আমিনুল ইসলামের লেখা পাশ্চাত্য দর্শনঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগ। এছাড়া বি.এল. দাসের লেখা অপরাধ বিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) বইটির সাহায্য নেয়া হয়েছে।

এসব বই, প্রবন্ধ, ডকুমেন্টারীর সাথে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা।

---মুরাদুল ইসলাম

গ্যাডফ্লাই

মুরাদুল ইসলাম



গুরুর কথা

ছেলেটি ঘুমিয়ে আছে কিন্তু তার সমস্ত মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। তার চোখের পাতা কাঁপছে এবং সে শুনতে পাচ্ছে এক অদ্ভুত কণ্ঠস্বর। কণ্ঠস্বরটি তাকে খসখসে কণ্ঠে নির্দেশ দিচ্ছে, "চলে যা তুই এখান থেকে। বিপদ এগিয়ে আসছে। আগুন এগিয়ে আসছে। ঘুম থেকে উঠ এবং দৌড়ে পালা।"

গ্রামে কয়দিন ধরেই থমথমে পরিস্থিতি। শহরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে। নীৎসে বলেছিলেন, মানুষ হচ্ছে সবচেয়ে হিংস্র প্রাণী। দাঙ্গার সময় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ধরনের দাঙ্গায় সবচেয়ে ভয়াবহ ক্ষতির মুখে পড়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। এই ছেলেটির পরিবার এই গ্রামের ধর্মীয় সংখ্যালঘু। সংখ্যাগরিষ্ঠরা তাদের ছোট কুঁড়েঘরের সামনে জড়ো হয়েছে। কয়েকজনের হাতে মশাল, কয়েকজনের হাতে কেরোসিনের টিন।

অদৃশ্য কণ্ঠস্বরের কণ্ঠের তীব্রতা বাড়লো। কণ্ঠস্বরটি নির্দেশের স্বরে বলল, "উঠে যা, ঘুম থেকে উঠে দৌড়ে পালা।"

ছেলেটি চোখ মেলে তাকাল। অদৃশ্য কণ্ঠের নির্দেশে সে ভয় পেয়েছে। খুব সম্ভবত সে কোন ভয়ংকর স্বপ্নও দেখছিলো। মুখের ঘাম হাত দিয়ে মুছে সে শুনতে পেল বাড়ির সামনের দিক থেকে লোকজনের কথাবার্তার শব্দ। সে পিছনের কক্ষে ছিল। অন্যঘরে শুয়ে আছেন তার মা, বাবা ও ছোট বোন।

ছেলেটির বয়স আট। সে ভীত চোখে সামনের ঘরের দিকে তাকালো এবং কি শব্দ হচ্ছে বা কারা কথা বলছে দেখতে সেদিকে যেতে চাইলো। কিন্তু সে পা বাড়াতেই অদৃশ্য কণ্ঠ শাসানোর স্বরে বললো, "খবরদার! ওদিকে পা বাড়াবি না। পিছনের দরজা খুলে দৌড়ে পালিয়ে যা। এ গ্রাম ছেড়ে চলে যা।"

ছেলেটি চারপাশে তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগলো। সে কোনক্রমে পিছনের দরজাটা খুললো। বাইরে তরল আলকাতরার মত কালো অন্ধকার।

অদৃশ্য কণ্ঠ আদেশের সুরে বললো, "যা, দাঁড়িয়ে থাকার সময় নেই। দৌড় দে।"

ছেলেটি ভয়ে বা অন্য কোন তাড়নায় অন্ধকারের মধ্যে দৌড় দিলো। এক নিঃশ্বাসে ছুটে গেল কিছুদূর। তারপর যেন পিছন থেকে আলো আসছে বুঝতে পারলো সে। এবং তাকিয়ে দেখল তাদের ছোট্ট ঘরে দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন।

মা, বাবা ও বোনের জন্য ছেলেটির ইচ্ছে হচ্ছিল দৌড়ে আবার ফিরে যেতে। কিন্তু অদৃশ্য কণ্ঠস্বর তাকে নির্দেশ দিলো, "পিছনে না তাকিয়ে সোজা দৌড়ে গ্রাম থেকে চলে যা।"

ছেলেটা দৌড়াতে লাগলো গাঢ় অন্ধকারের ভেতর দিয়ে। এক অদৃশ্য কণ্ঠস্বর, এক স্বর্গীয় বা ভৌতিক এবং ব্যাখ্যাতীত নির্দেশও চললো তার পিছু পিছু। সে ডাইমন অদৃশ্যে থেকে যেন সেদিন থেকেই তৈরী করা শুরু করে দিল আরেকটি গ্যাডফ্লাই।

প্রথম অধ্যায়

ছায়ামূর্তিটিকে দেখার পর থেকে ডিয়াগো ডি লান্ডা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। ডাইনি, প্রেতাত্মা, শয়তানের উপাসক ইত্যাদি ব্যাপারে তার জ্ঞান কম না। কিন্তু কখনও সরাসরি এদের উপদ্রব কোথাও দেখেননি এবং এই ছায়ামূর্তিটির মত ভয়ংকর কিছু তিনি কল্পনাও করেননি।

ডিয়াগো ডি লান্ডা অদ্ভুতভাবে চেয়ারে বসে আছেন। চেয়ারের সামনের একটা টেবিলের উপর দুই পা তুলে। তার মুখ ভয়ানক চিন্তিত। দুশ্চিন্তায় কপাল কুঁচকে আছে। স্প্যানিশ কনকুইস্ত্রেডররা এই ইউকাটান পেনিনসুলায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করেছেন। মন্টেজো দ্য ইয়ংগার প্রতিষ্টিত করেছেন শহর মেরিদা।

এই শহর প্রতিষ্ঠা করার আগে থেকেই কনকুইস্ত্রেডরদের ইচ্ছা ছিল মায়াদের রোমান ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসে নিয়ে আসা। এজন্য কিছু লোককে নিয়োজিত করা হয়েছিল। কিন্তু তারা তেমন কিছু করতে পারেনি। এখন দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে এখানে এসেছেন ডি লান্ডা।

তার ওপর গুরুদায়িত্ব। অসভ্য মায়ান লোকগুলোকে রোমান ক্যাথলিক বিশ্বাসে বিশ্বাসী করে তোলা। এ কাজ করতে হিমশিম খাচ্ছেন কৃশকায় এই ফ্রান্সিসকান মোনক। এর মাঝে ঘটছে অদ্ভুত কিছু ঘটনা।

ঘটনাটির শুরু মূলত কিছুদিন আগে।

ডিয়াগো ডি লান্ডা গীর্জার পাশে তার কক্ষে ছিলেন। জানলা দিয়ে দেখতে পেলেন কয়েকজন স্প্যানিশ সৈন্য গীর্জার সামনের একটা পিরামিডের কাছে জড়ো হয়ে কি একটা জিনিস দেখছে। ডি লান্ডার আগ্রহ হলো। তিনি বের হয়ে তাদের কাছে গেলেন।

তাকে দেখতে পেয়ে সম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল সৈন্যরা।

ডি লান্ডা জিজ্ঞেস করলেন, "কি হচ্ছে এখানে?"

একজন বলল, "ফাদার, আমরা এই জিনিসটি খুঁজে পেয়েছি।"

সে নিচে মাটির দিকে নির্দেশ করলো। কিছু জায়গা খোঁড়া হয়েছে। এই জায়গা খুঁড়তে গিয়েই বের হয়েছে বস্তুটা। ডি লান্ডা দেখতে পেলেন মাটিতে পড়ে আছে একটি মাথার খুলি। তিনি বসে খুলিটি হাতে নিলেন। এটি কোন মানুষের মাথার খুলি না। ধাতু দিয়ে নির্মিত খুলি। চোখের অংশে কোয়ার্টজ।

ডি লান্ডার খুলিটি ভালো লেগে গেল। তিনি খুলিটিকে নিয়ে আসলেন তার ঘরে। ধুয়ে রেখে দিয়েছেন। লেগে থাকা মাটি পরিস্কার হয়ে যাবার পর খুলিটি যেন চকচক করছে।

কিন্তু এই খুলিটি ঘরে আনার পরেই অদ্ভুত কিছু ঘটে চলেছে। সে রাতে নিয়ম মত ডি লান্ডা শুয়েছিলেন। গভীর রাত। চারিদিকে নিস্তব্ধতা। তার বিছানা জানালার পাশেই। ভয়ংকর কি এক স্বপ্ন দেখে তার ঘুম ভেঙ্গে

গেল। ঘুম থেকে উঠে তিনি চারপাশে তাকালেন। তার চোখ গেল জানালার দিকেই। আর তাতেই তিনি কেঁপে উঠলেন। বিভৎস চেহারার এক লোক কালো কাপড়ে মাথা ঢেকে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

ডি লান্ডা তাকাতেই সে সরে যায়।

আর তিনি ঘুমোতে পারেননি। জানালা বন্ধ করে বসেছিলেন বাকি রাত।

এরপর থেকে আরো তিনবার তিনি বিভৎস ছায়ামূর্তিটাকে দেখেছেন। অদ্ভুত তার মুখ, বিকৃত এবং বিষাদে যেন কালো হয়ে আছে।

একটি কালো রঙয়ের প্রজাপতি সারা ঘরময় উড়ে বেড়াচ্ছে। ডি লান্ডা প্রজাপতির দিকে তাকিয়ে আছেন কপাল কুঁচকে। কালো প্রজাপতি তার ভালো লাগে না। মায়ানরা মনে করে মৃত যোদ্ধাদের আত্মা প্রজাপতি রূপে ফিরে আসে। এটা কি তাহলে কোন মৃত মায়া বীর যোদ্ধার আত্মা? এবং সেই যোদ্ধার আত্মাই কি রাতে কালো পোষাকে.........

তার চিন্তায় বাঁধা পড়লো কারণ ভৃত্য পতোয়া এক কাপ গরম কফি হাতে প্রবেশ করে বললো, "ফাদার, কফি।"

চিন্তার ব্যঘাত ঘটায় ডি লান্ডা বিরক্ত হলেন। কিন্তু মুখে শান্তভাব বজায় রেখে বললেন, "কফির জন্য বলেছি?"

ভৃত্যের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। তার মনিবের মেজাজ ভাল নেই। সে কি করবে কিছুক্ষণ ভেবে পেল না। তারপর বলল, "না মানে ......ফাদার, আমি ভেবেছিলাম আপনি পছন্দ করবেন। উন্নতমানের কফি বীজ থেকে উৎপন্ন কফি গতকাল দিয়ে গেছেন এক অফিসার। কড়া গন্ধ।"

এবার আর বিরক্তি আড়াল করতে পারলেন না ডি লান্ডা। তার চোখে মুখে বিরক্তি ফুটে উঠায় ভৃত্য বেশ ভয় পেয়ে গেল। সে দ্রুত কয়েকবার দুঃখিত বলে যেতে উদ্যত হল।

ডিয়াগো ডি লান্ডা দেখলেন ছেলেটা কফি হাতে চলে যাচ্ছে। গরম কফির গন্ধ নাকে আসছে। মিথ্যে বলেনি। আসলেই কড়া গন্ধ। কফি হাতে ভৃত্য যখন দরজা পার হচ্ছিল তখন ডি লান্ডা গম্ভীরভাবে বললেন, "এদিকে নিয়ে আসো।"

পতোয়া ঘুরে দাঁড়ালো। এক ধরনের ভয় এবং খুশির মিলিত আবেগ নিয়ে সে ডি লান্ডাকে কাপ এগিয়ে দিল। ডিয়াগো ডি লান্ডা প্রথমে কিছুক্ষণ কাপের কফির দিকে তাকিয়ে রইলেন। অতঃপর গভীরভাবে ঘ্রাণ নিলেন। এরপর কাপে চুমুক দিতে দিতে তিনি ভৃত্যকে বললেন, "কাল যা করতে বলেছিলাম তা করতে পেরেছ?

পতোয়া বাম হাত দিয়ে ঘাড়ের ডানদিকটা চুলকে বলল, "আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি ফাদার। খুব সম্ভব আজকে সন্ধ্যার মধ্যে একটা সুখবর আপনাকে দিতে পারবো।"

ডি লান্ডা চিন্তিতভাবে কাপে কয়েকবার চুমুক দিলেন। এরপর ভৃত্য পতোয়াকে বললেন, "ঠিক আছে। এখন যাও।"

পতোয়া চলে যাবার পর তিনি তার কর্মপন্থা নিয়ে ভাবতে বসলেন। তার আসলে বর্তমানে ভাবা ছাড়া কোন কাজ নেই। মায়ান গ্রামের লোকদের মাঝে ধর্মপ্রচার করতে হুট করে কিছু করা যাবে না। ডি লান্ডা বুদ্ধিমান লোক। তিনি এটা বেশ ভালভাবেই বুঝেন। হুট করে কাজ করে বোকারা। করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ফেঁসে যায়।

এখানে ডি লান্ডা আসার আগে ধর্মপ্রচারের কাজ যারা করেছিল তারা কেউ সফল হতে পারেননি। তারা সবাই প্রায় ব্যর্থ হয়েছেন। ডি লান্ডার জন্য তাই দায়িত্বটা অনেক বড়। এবং ভয়াবহও বলা যায় কিছুটা। পাদ্রী জন পল এখানে কাজ করতে এসে খুব অদ্ভুতভাবে মারা গিয়েছিলেন। তিনিই এই অঞ্চলে ধর্ম প্রচারের কাছে কিছুটা গতি নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু ঠিকমত কোন ফল পাবার আগেই একদিন সকালে তাকে এই কক্ষেই মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। মুখ দিয়ে কালো রক্ত বমি করতে করতে তিনি মারা যান। তার লাশের চোখ দুটি ছিলো খোলা এবং বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে এমন।

ডি লাভা বিশ্বাস করতেন এই মৃত্যুর সাথে ভৌতিক কোন কিছুর সম্পর্ক নেই। এছাড়া এটাও তার দৃঢ় বিশ্বাস কোন অশুভ শক্তি তার ধারে কাছে ঘেঁষতে পারবে না। মহান ঈশ্বরের শক্তিতে তিনি শক্তিমান। সেই শক্তির গুণেই তিনি শয়তানকে পরাজিত করতে পারবেন। এই অঞ্চলের লোকেরা শয়তানের মূর্তির উপাসনা করে বলে তিনি জানতেন। কিন্তু সেই শক্তির ক্ষমতা সম্পর্কে তার কোন ধারণা ছিলো না। ছায়ামূর্তিটিকে রাতে দেখার পর এ সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে তার। এছাড়া তিনি ধাতব খুলিটার শক্তিও দেখতে চান। এই অঞ্চলের শামানরা এ ধরনের খুলি ব্যবহার করত বলে শোনা যায়।

বিকেলের দিকে ভৃত্য পতোয়া খবর নিয়ে এলো। ডি লাভা তখন গীর্জার সামনের খোলা জায়গায় একটা লাঠি হাতে নিয়ে হাটছিলেন। প্রতিদিন এই সময়ে হাটা তার অভ্যাস। কালো কুচকুচে লাঠিটা সবসময় তার সাথে থাকে। এইসসব এলাকার চারপাশে যেহেতু জঙ্গল তাই বিষধর সাপ বা এরকম জীবজন্তু থাকা অস্বাভাবিক না, ডিয়াগো ডি লাভা এ ব্যাপারে সতর্ক।

ভৃত্য পতোয়া এসে বললো, "ফাদার, সুখবর আছে।"

ডি লাভা মুখ তুলে তাকালেন। এর অর্থ হল "বলে যাও"।

ভৃত্য বললো, "ঐ গ্রামের বুড়ো সর্দার রাজি হয়েছে।"

ডি লাভা গম্ভীরভাবে বললেন, "হুম।"

পতোয়া বললো, "কিন্তু একটা সমস্যা আছে ফাদার।"

"কি সমস্যা?"

"বুড়ো লোকটা বলেছে সঙ্গে কোন ধরনের অস্ত্র নেয়া যাবে না। তিনজনের বেশি লোক নেয়া যাবে না।"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পতোয়ার দিকে তাকিয়ে ডি লান্ডা বললেন, "তাতে সমস্যার কি আছে?"

পতোয়া চোখ বড় বড় করে বললো, "ফাদার, আপনি বুঝতে পারছেন না। এরা বিদঘুটে প্রকৃতির লোক। কখন কি করে বসে তার কোন ঠিক নেই। এদের কাছে অস্ত্রহীনভাবে যাওয়া উচিত হবে না। তারা আমাদের সৈন্যদেরও বাগে পেলে মেরে ফেলে।"

ডি লান্ডা গম্ভীরভাবে বললেন, "উচিত, অনুচিত দেখার দায়িত্ব আমার না তোমার উপর? আর আমি যদি সৈন্যদের নিয়ে যাই তাহলে ওরা তো আমার সাথে কথাই বলবে না।"

পতোয়া বললো, "এভাবে নিরস্ত্র অবস্থায় যাওয়ার অনুমতি মন্টেজো দ্য ইয়ংগারের কাছ থেকে মিলবে না। এই ঝুঁকি তিনি নিতে চাইবেন না।"

ডি লান্ডা বললেন, "আমরা তাকে না জানিয়েই যাবো।"

পতোয়া চুপসে গেল। তার চোখমুখে ফুটে উঠল হতাশ একটা ভঙ্গি। ডি লান্ডা দেখে বেশ মজা পেলেন। তিনি পতোয়াকে বললেন, "চিন্তা করার কিছু নেই। কাল আমরা

যাব। ঈশ্বরের বানী প্রচার করতে এসে ভয় করলে চলে না। সবসময় ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখবে। নাকি ঈশ্বরের উপর আস্থা নেই?"

পতোয়া দ্রুত মাথা নেড়ে বললো, "আছে ফাদার।"

ডি লান্ডা খুশি হলেন। এই ভৃত্য পতোয়া তার সাথে আছে পাঁচ বছর ধরে। একটু বোকা প্রকৃতির হলেও ভাল ছেলে। ডি লান্ডা একে অনেক পছন্দ করেন। এই অসভ্য মায়াদের মধ্যে ঈশ্বরের বানী প্রচারের কাজে পতোয়া তার প্রধান সহকারী। খুব সম্ভবত এই কাজের জন্য সে পরকালে স্বর্গে পৌঁছে যাবে। যৌবনে একবার একটা কথা শুনেছিলেন, মহামানবেরা হচ্ছেন নদীতে ভাসমান কাঠের গুড়ির মতো। তুচ্ছ প্রাণিকূল তার উপর চড়ে সহজেই অন্য পাড়ে চলে যায়। ডি লান্ডার ঠোঁটের কোনে হাসি ফুটে উঠে। আবার পরক্ষণেই তার ভয় হতে থাকে। তিনি কি এই কঠিন দায়িত্ব পালন করতে পারবেন ঠিকমতো? মনে মনে ঈশ্বরের নামে স্মরণ করতে করতে অন্যমনস্কভাবে হাটতে লাগলেন তিনি।

পরদিন সকালে ডিয়াগো ডি লান্ডা পতোয়াকে সাথে নিয়ে চললেন একটি মায়ান গ্রামের দিকে। তিনি সম্পূর্ন নিরস্ত্র। পতোয়া ভেবে পাচ্ছে না এটা ঠিক কোন মাত্রার দুঃসাহস। স্প্যানিশ কনকুইস্ত্রেডররা যখন মায়াদের এই অঞ্চলে আক্রমণ করে তখন তাদের বাঁধা দেবার মত তেমন কোন বড় শক্তি ছিল না। রাজবংশগুলো বিলুপ্ত

হয়েছিল। বড় প্রাসাদ ও ভবনগুলো হয়েছিল পরিত্যক্ত। লোকজন এলাকা ছেড়ে গিয়েছিল বা বিলুপ্ত হয়েছিল কোন এক অদ্ভুত কারণে। সামান্য কিছু রয়ে গিয়েছিল ছোট ছোট কিছু গ্রামে। স্প্যানিশদের মূলত যুদ্ধ করতে হয়েছে এই গ্রামবাসীদের সঙ্গে। এখানে ওখানে জঙ্গলের খুব গভীরে ছোট ছোট গ্রাম। এদের অস্ত্রশস্ত্র সেকেলে হলেও মনের জোর ছিল অনেক। তাই কয়েকদিন তারা বাঁধা দিতে পেরেছিল। শেষপর্যন্ত স্প্যানিশদের শক্তিশালী অস্ত্র ও আধুনিক রণকৌশলের সাথে তারা পেরে উঠেনি। আবার স্প্যানিশরাও সব গ্রাম পুরোপুরি জয় করে নিতে পারেনি। ধীরে ধীরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু মাঝে মধ্যেই মায়াদের সাথে স্প্যানিশ সৈন্যদের সংঘর্ষ হয়। অবশ্য ইতিমধ্যে প্রায় বেশিরভাগ মায়া সর্দারেরা মন্টেজো দ্য ইয়ংগারের কাছে স্প্যানিশদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে।

কিন্তু গ্রামগুলো আগের মতই আছে। এসব গ্রামে নিরস্ত্র অবস্থায় গিয়ে অক্ষত ফিরে আসা যাবে কি না নিশ্চিত করে বলা যায় না। অর্ধ উলঙ্গ মায়া গ্রামবাসীদের সম্পর্কে অনেক ভয়ংকর কথাই শোনা যায়। বনে থাকতে থাকতে এদের প্রকৃতিও নাকি বন্য। কিন্তু এই বন্যেরা এত সুপরিকল্পিত পিরামিড নির্মান করেছিল কীভাবে তা ভেবে আশ্চর্য হতে হয়।

ডিয়াগো ডি লান্ডাও আশ্চর্য হয়েছেন। মূলত এই থেকে তিনি সাহসও পেয়েছেন। হয়তো এদের যতটা বর্বর মনে করা হয় এরা ততটা বর্বর না।

পতোয়াকে সাথে নিয়ে উঁচু নিচু ভূমির উপর দিয়ে চলেছেন ডি লান্ডা। পাশে একুট দূর দিয়ে বয়ে চলেছে আশ্চর্য সুন্দর নদী কোপান। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭০০ মিটার উঁচুতে অবস্থিত এ অঞ্চলের তাপমাত্রাও সহনীয় পর্যায়ের। ডি লান্ডার হাতে তার প্রিয় কালো লাঠি। পতোয়ার হাতে একটি চামড়ার ব্যাগ। তাতে আছে পবিত্র বাইবেল এবং পানি।

প্রায় ঘন্টাখানেক হাটার পর ডি লান্ডা গ্রাম দেখতে পেলেন। ছোট ছোট ঘর দেখা যাচ্ছে। তাদের আগমন পথের দিকে নিশ্চয়ই দৃষ্টি রেখেছিল কেউ। তাই দেখা যাচ্ছে অভ্যর্থনার জন্য কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে। এদের দেখে ডি লান্ডা প্রথমবারের মত একটু ভয় অনুভব করলেন। তিনি মনে মনে কয়েকবার ঈশ্বরের নাম নিলেন। তারপর একটি গাঢ় নিঃশ্বাস ছেড়ে পতোয়াকে হাতের লাঠিটি দিয়ে বললেন, “ব্যাগ থেকে বাইবেল বের করো।”

পতোয়া ব্যাগ খুলে বাইবেল বের করে ডি লান্ডার হাতে দিলো। ডিয়াগো ডি লান্ডা পবিত্র গ্রন্থে শব্দ করে চুমু খেলেন। তারপর শক্ত করে তা বুকের সাথে চেপে ধরে চললেন সামনে।

অদূরেই দাঁড়িয়ে আছে অর্ধ উলঙ্গ লোকগুলো। তাদের সবার গলায় অদ্ভুত ধরনের সব অলংকার। একজনের মাথায় পাখির পালকের তৈরী মুকুট। মুকুট দেখে বুঝা যাচ্ছে সেই এদের দলপতি।

ডিয়াগো ডি লান্ডা এবং পতোয়া এদের প্রায় কাছে এসে দাঁড়ালেন। দলনেতা ইউকাটান ভাষায় বললো, "আমাদের গ্রামে আপনাদের স্বাগতম।"

ডি লান্ডা মাথা নেড়ে ইউকাটান ভাষায় উত্তর দিলেন, "ধন্যবাদ।"

ডি লান্ডা দেখলেন তার চারপাশে যে অদ্ভুত মানুষগুলো জড়ো হয়েছে এদের সবার হাতেই লাঠি। পতোয়া ভয়ে চুপসে গেছে।

ডিয়াগো ডি লান্ডা বাইবেল বুকের সাথে শক্ত করে ধরে বললেন, "দেখুন, আমি ঈশ্বরের সেবক। মানুষের সেবা করা আমার কাজ। আমি আপনাদের সাথে মারামারি করতে আসিনি। আপনাদেরকে শুধুমাত্র ঈশ্বরের বানী শোনাতে এসেছি।"

মায়াদের দলনেতা অভিজ্ঞ এবং ধূর্ত চোখে ডি লান্ডা এবং পতোয়াকে পর্যবেক্ষণ করছিল। সম্ভবত সে বুঝতে পেরেছিল এদের সাথে কোন অস্ত্র নেই। তাই একটু এগিয়ে এসে নিশ্চিত হবার জন্য খসখসে গলায় জিজ্ঞেস করলো, "সাথে কোন অস্ত্র নেই তো?"

ডি লান্ডা বললেন, "না নেই। ঈশ্বরের পবিত্র বানী শোনাতে অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না।"

মায়াদের দলনেতা ডি লান্ডার চারপাশে ঘুরে তাকে ভালো করে দেখে নিল। তারপর বলল, "তুমি যদি আমাদের কোন ক্ষতি না করো তাহলে আমরা তোমার কোন ক্ষতি করবো না।"

লান্ডার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি যেন সাহস ফিরে পেলেন। বললেন, "আমি তোমাদের কেবল ঈশ্বরের বানী শোনাব।"

সেদিন মায়া গ্রামটির সাথে ডিয়াগো ডি লান্ডার যেন ছোট একটি শান্তিচুক্তি হয়ে গেল খুব সহজেই। তিনি প্রতিদিন সে গ্রামে গিয়ে লোকদের প্রভু যিশুর বানী শোনাতে লাগলেন। তার কণ্ঠ ছিল মায়াবী। বাইবেলের বিভিন্ন ঘটনা তিনি এত আবেগ দিয়ে বর্ননা করতেন যে শ্রোতাদের চোখ ছলছল করতো।

এরকম চললো বেশ কিছুদিন। আশ্চর্যজনকভাবে এই ক'দিনে একবারের জন্যও তিনি সেই ভয়ংকর ছায়ামূর্তিটির দেখা পেলেন না। গভীর রাত পর্যন্ত জানালা খুলে বসে থেকেও তিনি কিছু দেখতে পাননি। ফলে সেদিনের দেখা ছায়ামূর্তিটির ব্যাপারে ডি লান্ডা নিজেই অবিশ্বাস করতে শুরু করলেন। হয়তো তিনি দেখেননি এরকম কিছু, হয়তো চাঁদের আলো গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে এসে ছায়ামূর্তির মত কিছু একটা তৈরী করেছিল।

ডি লান্ডা প্রতিদিন নিয়ম করে মায়াদের গ্রামে গ্রামে গিয়ে ধর্মের বাণী শুনিয়ে আসছিলেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হচ্ছিল না বলতে গেলে। অর্থাৎ মায়াদের প্রাচীন ধর্ম থেকে রোমান ক্যাথলিক হচ্ছিল না কেউ। ডি লান্ডা গ্রামে গেলে লোকেরা ভীড় করতো শোনার জন্য। শুনতো খুব মনযোগ সহকারে। কিন্তু কেউই ধর্মান্তরিত হচ্ছিল না। ডি লান্ডার দুশ্চিন্তার অবসান হলো না। এত চেষ্টার পর একজনও ধর্মান্তরিত না হওয়ায় তিনি বেশ হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তার কেন যেন মনে হচ্ছিল তিনি ভুল পথে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কোথাও একটা বড়সড় ভুল রয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে ডি লান্ডা আরো অনেক মায়া গ্রামে যাওয়া শুরু করেছেন। এখন তিনি একাই চলে যান। পতোয়া প্রায় সময়ই তার রুমে গিয়ে দেখে তিনি নেই। ডি লান্ডাকে তখন নেশায় পেয়েছে। এই বন্য মায়া লোকগুলোকে বুঝার নেশা। রোদে ঘুরতে ঘুরতে তার গায়ের রঙ হয়ে গেছে তামাটে। একসময় তার কাছে জঙ্গলের ভেতরের প্রায় সব রাস্তাই পরিচিত হয়ে উঠলো। আশপাশের প্রায় সব গ্রামেই তিনি পরিচিত মুখ। প্রিয় মুখ। মানুষের গল্প শোনার প্রবৃত্তিটা খুব আদিম। মায়া লোকদের মধ্যেও তা ছিলো। তাই অসাধারন গল্প বলিয়ে ডি লান্ডা স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

ডি লান্ডা বাইবেলের চমকপ্রদ সব গল্প বলতেন তাদের। যিশুর মানুষকে ভালোবাসার গল্প, মৃতকে জীবন দানের গল্প, কুষ্ঠরোগীকে রোগমুক্ত করার গল্প, যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়া ও পুনরায় দেখা দেওয়ার মর্মস্পর্শী গল্প। এসব গল্প মায়া গ্রামবাসীদের কাছে ছিল একেবারে নতুন। তারা মুগ্ধ হয়ে শুনতো।

ডি লান্ডা একরকম ভালোই ছিলেন। ধর্মের কথা বলতে পেরে তার মানসিক শান্তিও ছিলো। কিছুটা অস্বস্তি যে ভেতরে ছিলো না এমন নয়। কিন্তু তিনি ভেবেছিলেন এভাবে ধর্মের বানী প্রচার করতে থাকলে একদিন নিশ্চয়ই এই লোকগুলো ধর্ম গ্রহণে আগ্রহী হবে।

হয়তো এভাবে চলতো সবকিছু। কিন্তু একদিনের একটি ঘটনা ডি লান্ডার সব ভাবনা পাল্টে দিলো।

সেদিন ডিয়াগো ডি লান্ডা পতোয়াকে সাথে নিয়ে বনের গভীরে একটা গ্রামে গিয়েছিলেন ধর্মের কথা বলার জন্য। সারাদিন ওখানে ছিলেন। বিকেলের দিকে ফিরছিলেন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল সেদিন। সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়ে অস্ত যাবার পূর্বক্ষণে আছে। এমন সময় ডি লান্ডা শুনতে পেল জঙ্গলের ভেতর থেকে আসছে হালকা বাদ্যের শব্দ এবং একদল মানুষের কথাবার্তা। তার কৌতুহল হল। তিনি শব্দ এবং মানুষজনের কথাবার্তা লক্ষ্য করে একটু এগিয়ে গেলেন।

খানিকটা যাবার পর তিনি যা দেখলেন তাতে তার গা শিউরে উঠলো। কিছু দূরে জঙ্গলের ভেতর একটি খোলা জায়গায় একদল লোক জড়ো হয়েছে। লান্ডা ওদের প্রত্যেকের মুখের সাথে পরিচিত। এদের গ্রাম এখান থেকে খুব দূরে না। সে গ্রামে অনেকবার গিয়েছেন তিনি। ধর্মের বানী প্রচার করেছেন। এই লোকগুলোই ছলছল চোখে জোসেফ, জ্যাকব, ডেভিডদের কাহিনী শুনেছে।

কিন্তু এরা আজ এই জঙ্গলে সমবেত হয়েছে একটি পাশবিক কাজের জন্য। ডি লান্ডা এরকম কিছু ধারণা করেছিলেন অবশ্য। কিন্তু মন থেকে বিশ্বাস করতে পারেননি। নিজের চোখের সামনে দেখতে পেয়ে তিনি হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন।

লোকগুলো খুঁটির সাথে এক যুবক ছেলেকে বেঁধে রেখেছে। খুব সম্ভবত একে কড়া কোন জাতের মাদক খাওয়ানো হয়েছে। ছেলেটি নিস্তেজ। তার চোখদুটি ঘোলাটে বর্ণ ধারণ করেছে। খুঁটির সামনে আগুন জ্বেলে বাদ্যের তালে তালে ঘুরে ঘুরে নাচছে কয়েকজন। আর দুজন লোক দাঁড়িয়ে আছে বাঁধা যুবকের দুপাশে। হাতে ধারালো ছুরি নিয়ে। তাদের দৃষ্টি মাথায় পাখির পালকের মুকুট পড়া দলনেতার দিকে। দলনেতা বিড়বিড় করে কি যেন জপছে। হাতে ধরে রেখেছে শুকনো একটি পাতা। বুঝা যাচ্ছে, মন্ত্র পড়া শেষ হলে এই পাতা ছেড়ে দিবে

আগুনে। সেটাই হবে ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে থাকা ঘাতকদের জন্য নিরব সংকেত।

দেখতে দেখতে দলনেতা লোকটি মন্ত্রপাঠ বন্ধ. করে হাতের শুকনো পাতাটি আগুনে ফেলে দিলো। ডি লান্ডা চিৎকার করে উঠলেন, "বন্ধ করো"!

কিন্তু চিৎকারের শব্দ মুখ থেকে বেরোলো না। এক জোড়া শক্ত হাত তার মুখ চেপে ধরেছে খুব ভালোভাবে। হাতদুটি পতোয়ার। ডি লান্ডা দেখলেন খুঁটির সাথে বাঁধা ছেলেটার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে। সেই মাথা আগুনের উপর ধরে মন্ত্র পড়ছে মাথায় পাখির পালক লাগানো লোকটি। কাটা মাথা থেকে জ্বলন্ত আগুনের উপর পড়ছে রক্ত।

পতোয়া খুব আস্তে করে ডি লান্ডার কানের কাছে মুখ এনে বললো, "ফাদার, শব্দ করবেন না। এরা মেরে ফেলবে।"

ডিয়াগো ডি লান্ডা সম্বিৎ ফিরে পেলেন। তিনি চিৎকার করে বোকামিই করতে যাচ্ছিলেন। এই লোকগুলো আছে ঘোরের মধ্যে। তারা যুবকের বুক কেটে যকৃত বের করে আগুনের উপর রেখে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করছে।

ডি লান্ডার মাথা ঘুরে এলো। পতোয়া আবার আস্তে করে বললো, "এরা এগুলো খাবে এখন।"

অন্ধকার নেমে এসেছে। ডি লান্ডা আর এসব দৃশ্য দেখবেন না মনস্থ করে পতোয়াকে বললেন, "চলো।"

গীর্জায় ফিরতে ফিরতে তিনি ভাবছিলেন এই দুলালেদের নিয়ে। সব ভাবনা উলট পালট হয়ে গেছে তার। দুটি পথ এলো তার ভাবনায়। এক-এদের সত্যপথে ফিরিয়ে আনতে অন্য পদ্ধতিতে এগুতে হবে অথবা দুই-ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হবে। শক্ত ধাঁচের মানুষ ডি লান্ডা। দ্বিতীয় পথের ভাবনাকে মন থেকে মুছে ফেলে দ্রুত পা চালাতে লাগলেন।

সেদিন রাতে ডি লান্ডার সাথে দেখা করতে এলেন মন্টেজো দ্য ইয়ংগার। তিনি এই সমস্ত অঞ্চলে স্প্যানিশদের নেতৃত্বে আছেন। তার পরিকল্পনা এবং পদক্ষেপের কারণেই এই অঞ্চলে স্প্যানিশদের কর্তৃত্ব দিন দিন বাড়ছে।

মন্টেজো এসে ডি লান্ডাকে সম্মান জানালেন। তারপর বললেন, "ফাদার, আপনি মায়াদের গ্রামে যান এ ব্যাপারে আমি শুনেছি। কিন্তু আপনার কাজে বাঁধা দিতে চাইনি বলে কিছু বলিনি এতদিন। কিন্তু পতোয়া আমাকে আজকের কাহিনী বলেছে। এরপর থেকে আমি আপনাকে একা একা কোথাও যেতে দিতে পারবো না। যে কোন সময় বিপদ হতে পারে। কিছুদিন আগেও এরা আমাদের তেরোজন সৈন্যকে বলি দিয়েছে তাদের মূর্তির সামনে।"

ডি লান্ডা বিছানায় শুয়ে ছিলেন। তিনি উঠে বসে বললেন, "ব্যাপারটা আমিও বুঝতে পেরেছি। এরকম করে

ওদেরকে ধর্মে বিশ্বাসী করা যাবে না। এরা বর্বর এবং অসভ্য।"

মন্টেজো মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

ডি লান্ডা বললেন, "এখন আমি অন্য উপায়ে চেষ্টা করব। এদের নিয়ন্ত্রণ করছে সাক্ষাৎ শয়তান। এই শয়তানকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত এদের সত্য পথে ফিরিয়ে আনা যাবে না।"

মন্টেজো বললেন, "ফাদার, আপনার যেকোন সাহায্যে আমি সর্বদা প্রস্তুত।"

ডি লান্ডা হেসে বললেন, "তোমার বাবাও একই রকম কথা বলতেন। যাইহোক, আমি কিছু পদক্ষেপ নেব এই অঞ্চলে ধর্ম প্রতিষ্ঠায়। আমি চাই এগুলো আপাতত কাউকে জানানো না হোক।"

মন্টেজো বললেন, "তাই হবে ফাদার। ধর্মের জন্য আপনি যা ভালো মনে করেন তাই করুন।"

ডি লান্ডা বললেন, "আমার কিছু অস্ত্রসহ সৈন্য লাগবে।"

মন্টেজো বললেন, "ফাদার, আমি জেনারেলকে বলে যাবো। সৈন্য সবসময় আপনার কাজের জন্য তৈরী থাকবে। এছাড়া আর কোন কিছুর দরকার হলেও আপনি জেনারেলকে বলবেন।"

ডি লান্ডা বললেন, "ঠিক আছে।"

আরো কিছুক্ষণ মন্টেজো ডি লান্ডার সাথে এই অঞ্চলে স্প্যানিশদের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করলেন। তারপর সালাম জানিয়ে তিনি চলে গেলেন।

সে রাতে ডি লান্ডা জ্বরে আক্রান্ত হন। প্রচন্ড জ্বরের ঘোরে সেদিন মধ্যরাতে আরেকবার দেখতে পান ছায়ামূর্তিটিকে।

শুয়ে ছিলেন ডি লান্ডা। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে। বাইরে তখন উজ্জ্বল চাঁদের আলো। ডিয়াগো ডি লান্ডা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখতে পান আপাদমস্তক কালো কাপড়ে ঢাকা একটি লোক ঠিক জানালার সামনে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

লোকটার মুখ বিকৃত। ডি লান্ডা বুঝতে পারলেন এই লোক শামান, কালো যাদুকর। ফ্রানিসকান মোনক হওয়ার সময় এদের সম্পর্কে জানতে হয়েছিলো। কালো যাদুবিদ্যার জগতে প্রবেশকারীরা শয়তানের উপাসনা করে। দুষ্ট আত্মাদের নিয়ন্ত্রণ করে। কালো যাদুর প্রভাব ধীরে ধীরে তাদের শরীরেও পড়ে। মুখ বিকৃত হয়ে যায়।

ডিয়াগো ডি লান্ডা খুব দ্রুত ঈশ্বরের নাম নিয়ে বুকে ক্রস আঁকলেন। কালো কাপড় পরিহিত লোকটি তখনো দাঁড়িয়ে আছে। যেন সে কিছু বলতে চায়। ডি লান্ডার গায়ে প্রচন্ড জ্বর। তিনি জ্বরের উত্তাপ অনুভব করতে পারছেন। তবুও তার মনে হলো বাইরে যাওয়া দরকার।

গিয়ে দেখা দরকার এ কে! কেন এখানে এসেছে এবং সে কি চায়!

ডিয়াগো ডি লান্ডার কৌতুহল ভয়কে ছাপিয়ে উঠলো। তিনি দরজা খুলে বাইরে বের হলেন। গভীর রাত। চারদিকে নিস্তব্ধতা। হালকা ঠান্ডা বাতাস বইছে। চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় ভাঙ্গা মায়া পিরামিডের পাশে এই কোপান অঞ্চল ভৌতিক সৌন্দর্যের মধ্যে ডুবে আছে যেন।

ডি লান্ডা স্পষ্ট দেখতে পেলেন তার প্রায় দশ হাত সামনে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে কালো কাপড় পরা লোকটি। ডি লান্ডা ঈশ্বরের বানী জানেন। তার পূর্ণ বিশ্বাস আছে ঈশ্বরের শক্তির প্রতি। কিন্তু তবুও এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে-তার কিছুটা ভয় হলো। তিনি ধীর পায়ে এগুতে লাগলেন। তার সামনের ছায়ামূর্তিটিও এগিয়ে যাচ্ছিল।

প্রায় মিনিট বিশেক হাঁটার পর ছায়ামূর্তিটি ভাঙ্গা পিরামিডের সামনে পৌছে গেল। ডি লান্ডা গেলেন তার পিছু পিছু। মূর্তিটি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। ডি লান্ডা দেখলেন সেই বিকৃত মুখ যা তিনি দেখেছিলেন জানালা দিয়ে। গম্ভীর এবং বিষাদগ্রস্থ মুখ।

ডি লান্ডা দাঁড়িয়ে রইলেন। তার বাস্তব জ্ঞান ফিরে এলো ভাঙ্গা পিরামিডটা দেখে। তিনি টেম্পল-১৬ এর কাছে! তার মানে গীর্জা থেকে অনেকদূর চলে এসেছেন!

কিছুদূরে কারো যেন পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ডি লান্ডা সচকিত হয়ে উঠলেন। সাথে মূর্তিটিও। এদিকে

কেউ আসছে বুঝা যাচ্ছে। মূর্তিটি ডি লাভার দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে নাউয়াতল ভাষায় বললো, "চলে যা! এখান থেকে চলে যা!"

তার কণ্ঠস্বর খসখসে।

এই কথা বলে ডিয়াগো ডি লাভার চোখের সামনে কালো ছায়ামূর্তিটি বাতাসে মিলিয়ে গেল।

পিছন থেকে গাঢ় কণ্ঠে দৃঢ় আওয়াজ এলো, "হ্যান্ডস আপ!"

ডি লাভা একে তো জ্বরে ভোগে দূর্বল ছিলেন। তার শরীর কাঁপছিল। ছায়ামূর্তিটির মিলিয়ে যাওয়া এবং সাবধান বাণীতে তিনি বিহ্বল হয়েছেন। ঠিক তখনি পিছন থেকে ইংরেজি ভাষায় হ্যান্ডস আপ শুনে তিনি উপরে হাত তুললেন ঠিকই কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। হাটু কেঁপে উঠেছিল তার। মাটিতে হাটু গেড়ে বসে পড়লেন।

কয়েকটি ক্ষীপ্র পা মুহূর্তের মধ্যে এসে তাকে ঘিরে ধরলো। চাঁদের আলোয় ডি লাভা দেখলেন তাদের হাতে ধাতব মারনাস্ত্র। রূপালি আলোতে চকচক করছে।

ডিয়াগো ডি লাভা জ্ঞান হারালেন।

জন মার্টিন ও স্টিফেন গ্রুভ দুজন অনুসন্ধিৎসু মানুষ। বিভিন্ন প্রাচীন ধ্বংসস্তুপে ঘুরে বেড়ানো, সেসব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা তাদের নেশা। এজন্য তারা ছুটে যেতে প্রস্তুত পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। এই মায়াদের ধ্বংসস্তুপের খবর তারা পেয়েছেন কিছু প্রাচীন নথিপত্র ঘাঁটতে গিয়ে।

শামানদের সম্পর্কে জানতে এই দুই কৌতূহলী ব্যক্তি গিয়েছিলেন সাইবেরিয়ায়। সাইবেরিয়া এক সময় ছিল শামানদের ঘাঁটি। শামান শব্দটিও এসেছে সাইবেরিয়ায় তুঙ্গুষবাসী মেষপালকদের কাছ থেকে। এর অর্থ হয়তো দাঁড়ায় "জানা" অথবা "যিনি সব জানেন"। যিনি জ্ঞাত আছেন পৃথিবীর এক গুঢ় গোপন সূত্র সম্পর্কে যা ব্যবহার করে তিনি বিচরণ করতে পারেন আত্মাদের জগতে। শামানদের নিয়ে লেখা এক প্রাচীন পুস্তকে ছিল কোপান রাজ্যের কথা। এখানকার শামানিজমও একটা গতি লাভ করেছিল একসময়। মায়াদের ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে শামানদের বিশ্বাসের মিল ছিল অনেক। এসব তথ্য পেয়ে দুই অনুসন্ধিৎসু পর্যটক এসেছেন হন্ডুরাস । উদ্দেশ্য কোন প্রাচীন পুস্তক বা এরকম কিছু পাওয়া যায় কি না খুঁজে দেখা। এখানে এসে ভগ্ন প্রাচীন পিরামিডগুলো চষে বেড়াচ্ছেন। নতুন পিরামিডের খুঁজে ঘুরছেন জঙ্গলে জঙ্গলে। স্প্যানিশরা সাধারণ পর্যটক মনে করে কোন বাঁধা দেয়নি।

অনুসন্ধানী জন মার্টিন ও স্টিফেন গ্রুভ এক অবিশ্বাস্য আবিষ্কার করেছেন গতকাল। তারা একটি পুরনো টেম্পলের সামনে খুঁজে পেয়েছেন চারকোনাকার একটি পাথর খন্ড। এর চারদিকে মোট ষোলজন মানুষের চিত্র খোদাই করা। মার্টিনের ধারণা এই ষোলোজন হচ্ছেন এই

[illegible] প্রাচীন কোন রাজবংশের রাজা। খুব সম্ভবত [illegible]গুলোতে তাদের সমাহিত করা হয়েছে।

মার্টিন ও গ্রুভ বেশিরভাগ কাজ করেন রাতে। তাতে তাদের সুবিধা। স্প্যানিশ সৈন্যরা রাতে থাকে না [illegible]। সৈন্যরা যদি কোনভাবে মনে করে তারা কোন [illegible] খুঁজছেন পিরামিডগুলোর ভেতরে তাহলেই সর্বনাশ। কাজ করতে দেবে না আর। এখানকার পিরামিডগুলোতে বহুমূল্যবান ধনসম্পদ আছে বলে জনশ্রুতি আছে। সুতরাং সাবধানতার জন্য রাতে কাজ করাই মঙ্গলজনক।

কিন্তু সেদিন রাতে কাজ করতে গিয়েই ঘটল বিপত্তি। তাদের খুব একটা দোষ না অবশ্য। জ্যোৎস্নালোকিত রাতে টেম্পল-১৬ এর আশেপাশে ছিলেন তারা। এই সময়ে একটা লোককে ধীরে পায়ে এগিয়ে যেতে দেখে তাদের মনে ভয় ও কৌতুহলের উদ্রেক হয়। পিস্তল হাতে সামনে এগিয়ে গিয়ে লোকটিকে ধরেছিলেন তারা। সেই লোকটি আসলে স্প্যানিশদের নিয়োজিত ফ্রান্সিসকান পাদ্রী। মায়া গ্রামবাসীকে রোমান ক্যাথলিক বিশ্বাসে বিশ্বাসী করার জন্যই এই লোককে নিয়োজিত করা হয়েছে। মার্টিন ও গ্রুভ দুজনই ভাল করে জানেন এই ধরনের লোকগুলো খুব একটা সুবিধার হয় না। এরা খুব কট্টর প্রকৃতির। তাদের ধর্মগ্রন্থে যা নেই বা নিষেধ সেগুলো তারা পৃথিবী থেকে মুছে দিতে চায়। যুগে যুগে শয়তানের উপাসক ঘোষনা দিয়ে শত শত লোককে পুড়িয়ে মেরেছে এরা।

লোকটি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত ছিল। মার্টিন ও গ্রুভের সাহায্যে সে তার কোয়ার্টারে পৌছেছিল। এই পাদ্রীর কাছে এভাবে পরিচিত হয়ে খুশি ছিলেন না অনুসন্ধানী দুজন।

ডিয়াগো ডি লান্ডাও খুশি ছিলেন না। তিনি সেদিন রাতে বিভ্রান্তিতে পড়ে যান। প্রাচীন চেহারার শামানের খসখসে গম্ভীর গলার সাবধান বানীর পর অতর্কিতে এই দুই লোকের আগমনে এবং তাদের হাতে ধাতব অস্ত্র দেখে তিনি জীবনের আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু খারাপ কিছু হয়নি। লোকগুলো তাকে হত্যা করেনি। এরা নিজেদের পরিচয় দিয়েছে পর্যটক হিসেবে। ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন দেশ ও প্রাচীন স্থাপনা দেখে বেড়ায়। ডিয়াগো ডি লান্ডা অবশ্য এদের ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত না। তিনি স্প্যানিশ সেনাপতির কাছ থেকে কিছু দক্ষ সৈন্য চেয়েছেন। তাকে এখন একটি দুরুহ কাজ করতে হবে।

ডিয়াগো ডি লান্ডা যখন ছোট ছোট মায়া গ্রামে ঘুরতেন তখন মায়া গ্রামবাসীদের সাথে তার সম্পর্ক হয়ে উঠেছিল চমৎকার। কেউ ধর্মান্তরিত হয়নি এটা ঠিক। তবে তারা ধর্মের কথা শুনেছে। ডি লান্ডা তাদের মন্দির দেখতে চাইলে দেখিয়েছে। দেখিয়েছে তাদের মন্দিরে রাখা প্রাচীন সব পুস্তক। ডি লান্ডা তাই জানেন কোন গ্রাম কোথায়। কোথায় তাদের মন্দির। কোথায় তাদের ধর্মগ্রন্থ তথা প্রাচীন পুস্তকাদি।

ডি লান্ডা এবার ধর্মপ্রচারে নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। তার জেদ চেপে গেছে। এছাড়া পর্যটকরূপী যে ছোকরাগুলো এসেছে তাদের মতলব কি কে জানে। তাদের উদ্দেশ্য 'সেইসব প্রাচীন পুস্তকাদি সংগ্রহ করা' হলে তো ভয়ংকর। এসব শয়তানের বানী তাহলে অক্ষয় হয়ে টিকে রইবে। ডি লান্ডা অবিশ্বাসী, ভগ্নস্তুপ খোঁড়াখোঁড়ি করা ছেলে-বুড়োদের ভাল করেই চিনেন।

ধর্মপ্রচারের নিমিত্তে ডি লান্ডাকে কিছু অস্ত্রসহ সৈন্য সাথে নিলেন। ডি লান্ডা ঠিক করলেন এদের নিয়ে কাছের গ্রামে যাবেন আজ। সব তার খুব পরিচিত।

রাতে ছায়ামূর্তির বিস্ময়কর আগমন এবং সাবধানবাণীতে ভিতরে ভিতরে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন ডি লান্ডা। তার মনে হচ্ছে আর বসে থাকা যাবে না। খুব অশুভ কিছু আছে চারপাশে। যার কারণে যেকোন সময় ভয়ানক কিছু ঘটে যেতে পারে। পাদ্রী জন পলের অস্বাভাবিক মৃত্যুও হয়তো হয়েছে এদের কোন শামানের কারসাজিতে।

রাতের ঘটনা নিয়ে অনেক চিন্তা করেছেন ডি লান্ডা। পর্যটক দুটি কোন চক্রান্ত করছে কি না এমন প্রশ্ন যে তার মাথায় আসেনি এমন নয়। একজনের বামহাতে তিনি একটি উল্কি দেখেছেন যা কখনও কখনও শামনরা ব্যবহার করতো। কিন্তু শামানের ছায়ামূর্তিটি আসলে কি? প্রাচীন মায়াদের কিছু শামান মাটির অনেক গভীরের কক্ষে

থাকতো এবং তাদের মৃত পূর্বপুরুষের আত্মাদের সাথে কথা বলতো বিভিন্ন প্রয়োজনে। এই ছায়ামূর্তিটি কি সেরকমই কিছু ছিল?

মার্টিন এবং গ্রুভ খবর পেলেন ফ্রান্সিসকান পাদ্রী ডিয়াগো ডি লান্ডা সেনাবাহীনির চৌকস কিছু সৈন্য নিয়ে পুরনো মায়া গ্রামগুলোতে হানা দিচ্ছেন। সেসব গ্রামের লোকদের জোর করে ধর্মান্তরিত করছেন। তাদের পুরনো ধর্মগ্রন্থগুলো মন্দির থেকে নিয়ে যাচ্ছেন।

তারা যা আশংকা করেছিলেন এমনই হচ্ছে। জন মার্টিন চিন্তিত মুখে বললেন, "কিছু একটা করতে হবে।"

স্টিফেন গ্রুভ উত্তর দিলেন, "কি করতে পারি আমরা? এই অঞ্চল তাদের দখলে। কিছু বলতে গেলে বেঘোরে মারা পড়বো।"

মার্টিন মাথার চুল খামচে বললেন, "তবুও কিছু করার চেষ্টা করে দেখতে হবে। বসে থাকলে চলবে না।"

জন মার্টিন ও ফ্রান্সিস গ্রুভ চললেন ফ্রান্সিসকান মোনক ডিয়াগো ডি লান্ডার কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করতে। ডি লান্ডা সেদিন দলবল নিয়ে বেড়োনোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন। প্রতিদিন সকালে এভাবে তিনি বের হন। একেকটা গ্রামে হানা দেন।

মার্টিন ও গ্রুভকে দেখে লান্ডা অবাক হলেন। কিন্তু অভিব্যক্তি লুকিয়ে রেখে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন "আপনারা এখানে? এই সময়ে?"

মার্টিন মার্জিতভাবে বললেন, "এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম স্যাদার। আপনাকে দেখতে পেয়ে চলে এলাম। কোথাও যাচ্ছেন নাকি?"

ডি লান্ডা প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললেন, "এদিকে কোথায় যাচ্ছিলেন?"

স্টিফেন গ্রুভ জবাব দেন, "টেম্পল-১৬ তে। আপনি কি এর সামনের চতুষ্কোন পাথরটা দেখেছেন? ওটাতে ষোলোজন প্রাচীন রাজার নাম আছে চিত্রের আকারে।"

ডি লান্ডা বিরক্তমুখে বললেন, "তাই নাকি! তা সময় করে একবার গিয়ে ভেঙ্গে ফেলব। হতেও পারে এটা এই অসভ্যদের কোন শয়তানের ছবি।"

মার্টিন ও গ্রুভ একে অন্যের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। তাদের হতবুদ্ধি মুখভঙ্গি দেখে খুশি হলেন ডি লান্ডা।

হাসিমুখে বললেন, "বিদায়! ঈশ্বর সবার মঙ্গল করুন।"

তিনি তার সৈন্যদের নিয়ে চলতে শুরু করলেন। আর নিরাপদ দূরত্বে থেকে তাকে অনুসরণ করতে লাগলেন মার্টিন ও গ্রুভ।

ডি লান্ডার সাথে সৈন্যদের যে দল ছিল তাদের একজনের হাতের একটি বোঝা। তাতে মায়াদের মন্দির থেকে সংগ্রহ করা সব পুরনো বইয়ের সংগ্রহ। ডি লান্ডা কোপান নদীর পাশে একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে আসলেন। তার

নির্দেশে সেখানে বানানো হলো এক বিরাট অগ্নিকুন্ড। সেই আগুনে ডি লান্ডা নিঃক্ষেপ করলেন প্রাচীন মায়াদের লেখা পুস্তকের বোঝা। দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। ডি লান্ডা সন্তুষ্ট চিত্তে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলেন। তার মতে "শয়তানের লেখা" এসব পুস্তক ধ্বংস করা এক বড় পূন্যের কাজ।

পুড়ে ছাই হতে লাগল কিছু বই অথবা প্রাচীন মায়াদের সভ্যতার অসামান্য কিছু দলিল। ডি লান্ডার ব্যাগে ছিল ধাতব খুলিটি। তিনি খুলি বের করে কিছুক্ষণ এর দিকে তাকিয়ে রইলেন। ঘৃণায় তার শরীর শিউরে উঠলো। শামান শয়তানের উপাসকদের এই খুলি ধ্বংস করে ফেলতে তিনি আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

আগুনে বইগুলো পুড়ছিল। শয়তানের পুস্তক পোড়া ধোঁয়া ক্ষতিকর ঘোষনা দিয়ে তিনি সরে গেলেন। একজন লোককে নিযুক্ত করলেন যে সব বই পোড়া শেষ হলে ছাই ফেলবে খরস্রোতা কোপান নদীতে।

ডি লান্ডা বাকিদের নিয়ে চলে গেলেন। আজ একটি ভয়াবহ কাজ করতে হবে। কিছু অবাধ্যকে বন্দি করা হয়েছিল। শত অত্যাচারেও এরা ধর্মত্যাগ করছে না। এদের মেরে ফেলতে হবে।

আর এদিকে জন মার্টিন ও স্টিফেন গ্রুভ একটি মহা সুযোগ পেয়ে গেলেন। ডি লান্ডা সৈন্যদের নিয়ে দৃষ্টিসীমার আড়ালে চলে যাওয়ার পর তারা আগুনের কাছে গেলেন।

লোকটি একমনে আগুন দেখছিল। গ্রুভ ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধরলেন। আর মার্টিন মাঝারি সাইজের এক পাথর খন্ড দিয়ে মাথায় আঘাত করে লোকটিকে অজ্ঞান করে ফেললেন। তারপর একটি লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে আগুন থেকে বের করে আনলেন আঁধপোড়া একটি বই এবং সেই ধাতব খুলি।

ডিয়াগো ডি লান্ডা এই মায়া লোকদের নিয়ে হতাশ ছিলেন। তিনি অটো-ডা-ফি ইনকুইজিশন অর্ডার করলেন। এর অনুসারে মায়াদের সব প্রাচীন বই পুস্তক, ধর্মীয় বিভিন্ন চিহ্ন, মূর্তি আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। ডি লান্ডার এই অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞ স্প্যানিশদের আমিরেকান অঞ্চলে করা অত্যাচারের কুখ্যাত "ব্ল্যাক লিজেন্ডের" অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা।

অনেক নিরপরাধ লোককে মারা হলো শুধুমাত্র তাদের বিশ্বাসের কারণে। ধ্বংস করা হলো মায়াদের সভ্যতার সব অবিশ্বাস্য গল্পগাথার সমাহার, তাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের রত্নতুল্য সংগ্রহ। পৃথিবীর অপূরণীয় ক্ষতি। জন মার্টিন ও গ্রুভ যে পুস্তক ও খুলিটি বাঁচিয়ে ছিলেন সেটা নিয়ে সেদিনই তারা কেটে পড়েন।

এই সব হত্যাকান্ড, অত্যাচার ও বিপুল ধ্বংসযজ্ঞের তথা বেআইনি ইনকুইজিশনের জন্য ডি লান্ডাকে অবশ্য এক সময় স্প্যানে বিচারের সম্মুখীন হতে হয়। কাউন্সিল অব ইন্ডিজ তার কার্যক্রমের নিন্দা করে তীব্র ভাষায়। তার

কৃতকাজ তদন্তের জন্য কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির নাম দেয়া হয়েছিল কমিটি অফ ডক্টরস। সেই কমিটি আবার ডি লান্ডাকে ক্ষমা করে দেয়। যিনি একটি সমৃদ্ধ সভ্যতার পুরো ইতিহাস জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন অবলীলায়, তিনি নিঃশর্ত ক্ষমা পেয়ে যান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বর্ষাকাল। নিয়মিত থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে। কয়েকটি ছোট বড় জাহাজ পূর্বদিক থেকে এসে সুতানুটি গ্রামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জাহাজের একটিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসার কর্তা জোব চার্ণক বিমর্ষ মুখে বসে আছে। প্রায় পয়ত্রিশ বছর আগে তিনি প্রথম এসেছিলেন ইন্ডিয়ায়। চট্টগ্রামে কুটি করে ব্যবসা করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মোগল সেনাপতির হাতে প্রচন্ডভাবে মার খেয়ে এখন চলেছেন সুতানুটি গ্রামের দিকে। আশ্রয়ের খোঁজে। জাহাজে কোম্পানির কিছু গোরা সৈন্য, জাদরেল সেনাপতি ক্যাপ্টেন ব্রুক এবং আরো কিছু ইংরেজ ছিলেন। এর মধ্যে একজন জলদস্যু। জোব চার্ণক যখন ভারতে আসেন তখন মাঝপথ থেকে সে সঙ্গী হয়েছিল। কি একটা বিরোধের জের ধরে তার দলের অন্য জলদস্যুরা তাকে ফেলে গিয়েছিল।

জোব চার্ণক তাকে আশ্রয় দিয়েছেন বলে সে তার প্রতি কৃতজ্ঞ।

সুতানুটি গ্রামে এসে জাহাজ থামল। কোম্পানির লোকদের নিয়ে চার্ণক নেমে গেলেন। এখন কঠিন সময়। দৃঢ় মনোবল নিয়ে এই অবস্থা মোকাবেলা করতে হবে। আকাশ কালো হয়ে আছে। আশপাশে কোন জনমানব নেই।

জোব চার্ণক বললেন, "এখানেই আপাতত আমাদের বসতি স্থাপন করতে হবে। সবাই ঘর তৈরী করতে লেগে যাও। ভাগ্যে কি আছে কে জানে। কিন্তু আমাদের চেষ্টা করে যেতে হবে।"

সবাই কাজে নেমে পড়ছিল তখন গুটি গুটি পায়ে বৃদ্ধ জলদস্যুটি জোব চার্নকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

জোব চার্ণক বললেন, "কিছু বলবে?"

জলদস্যুটি মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই। তার আগে আপনাকে আমার জীবনের গল্পটি শুনতে হবে।"

চার্ণক অনেকবার তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন। কিন্তু সে বলতে রাজী হয়নি। কিন্তু আজ নিজে থেকে বলতে এসেছে। চার্ণক আগ্রহী হয়ে বললেন, "তাহলে বলো।"

জলদস্যুটি বলতে লাগলো, "আমার বাবা ছিলেন ক্যারাবিয়ান সাগরের এক ডাকাত সর্দার। এক বিকেলে আমাদের জাহাজে সাহয্যপ্রার্থী হয়ে এসেছিল দুটি লোক। আমি তখন খুব ছোট। বাবা সে লোক দুটিকে সাহায্য করেননি। তাদের বন্দি করেন। লোক দুটির সাথে ছিল শামানদের ব্যবহার করা এক যাদুর মাথার খুলি ও একটি যাদুর বই। বাবা এই দুই জিনিস রেখে তাদের খুন করে সমুদ্রে ফেলে দেন। এই মাথার খুলিতে দুফোটা তাজা রক্ত দিয়ে যাদুর বইয়ে বর্ণিত কিছু মন্ত্র পড়লে তা ভবিষ্যত বলে

দিতে পারতো। জলদস্যু হিসেবে আমার বাবার এ কথা জানা ছিল। তিনি তাই খুলি ও বইটি যত্নে সংরক্ষণ করেছিলেন।"

জোব চার্ণক বললেন, "তারপর?"

জলদস্যুটি বললো, "তারপর আমার যখন মাঝ বয়েস তখন নেতৃত্ব নিয়ে দলের অন্যদের সাথে আমার ঝামেলা হয়। তখন বাবা মারা গেছেন। আমি প্রথমবারের মত খুলিটি ব্যবহার করলাম নিজের ভবিষ্যত জানতে। খুলিটি বলল আমি নেতা হতে পারবো না। আমি বিশ্বাস করলাম না। শেষপর্যন্ত খুলিটির কথাই সত্য হল। সঙ্গীদের বিশ্বাসঘাতকতায় মরতে বসেছিলাম। আপনি আশ্রয় দিয়ে বাঁচালেন। তাই আমি চাই এই দূর্যোগের মুহুর্তে আপনাকে খুলিটা দিয়ে সাহায্য করতে। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, চলতে ফিরতেও অক্ষম প্রায়। এই মূল্যবান বস্তুর আর দরকার নেই আমার।"

চার্ণক অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে বললেন, "তাই নাকি? দেখাও তো।"

বৃদ্ধ জলদস্যু তার ব্যাগ থেকে বের করলো ধাতব মাথার খুলি। চার্ণক হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, "এটা তো ব্রোঞ্জের মাথা মনে হচ্ছে।"

জলদস্যু বলল, "এটাই কথা বলবে।"

অন্য সবাই যখন কাজে ব্যস্ত তখন একটু দূরে গিয়ে জোব চার্ণক বসলেন জলদস্যুটির সাথে। একটি বড় ঝাঁকড়া আমগাছের নিচে। খুলিটা একটি কাপড় খন্ডের উপর রেখে অত্যন্ত সাবধানে বইটা বের করে কীসব পড়ে গেল জলদস্যুটি। তারপর ছুরি দিয়ে নিজের হাত কেটে রক্ত ছিটিয়ে দিলো ব্রোঞ্জের খুলির মুখে।

জোব চার্ণক লক্ষ করলেন ব্রোঞ্জের খুলিটির চোখে যেন লাল রঙ জ্বল জ্বল করছে।

বৃদ্ধ জলদস্যু বলল, "আপনি কি প্রশ্ন করতে চান?"

চার্ণক বললেন, "জিজ্ঞেস করো আমি যে কোম্পানি শুরু করেছি এদেশে তা কি টিকে থাকবে নাকি আমি পারবো না।"

বৃদ্ধ জলদস্যু গাঢ় কণ্ঠে ব্রোঞ্জের মূর্তিটিকে জিজ্ঞেস করলো "এদেশে আমাদের কোম্পানি কি টিকে থাকবে?"

ব্রোঞ্জের মাথাটি হঠাৎ করেই নড়ে উঠলো। তার কোয়ার্টজের চোখ লাল হয়ে যেন আলো ছড়াচ্ছে। খুলিটি মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানাল।

বিস্ময়াবিভূত চার্ণকের মুখ হাসিতে ভরে উঠল। এরকম অবিশ্বাস্য কিছু তিনি কখনও দেখেননি।

নদীর ধারে বৃষ্টি উপেক্ষা করে চালাঘর নির্মাণ করা হলো। শুরু হল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্যক্রম। দিনের বেলায় গাছের তলায় বসে চার্ণক ব্যাপারীদের সাথে জিনিসপত্রের দরদাম করেন। হুঁকোতে তামাক খান। তার

মনে বিপুল উৎসাহ। ব্রোঞ্জের মাথাটির হ্যাঁ বোধক উত্তরকে তিনি সত্য মনে করেন। একদিন তার এই কোম্পানি এদেশে জাঁকিয়ে ব্যবসা করবে।

কয়েকবছরের মধ্যে তিনি তার সেই স্বপ্ন নিয়েই মারা গেলেন। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ তখন। জলদস্যুটি মারা গিয়েছিল ম্যালেরিয়ায়। আর ব্রোঞ্জের মাথাটি এবং সেই বই রয়ে গেল ইংরেজ কোম্পানির হাতে।

চার্ণকের মৃত্যুর পর কোম্পানির দায়িত্বে এলেন চার্লস আয়ার। মূলত বই এবং ব্রোঞ্জের মাথাটি তার হাতে থাকলেও তিনি এর ব্যবহার জানতেন না। বর্ধমানের জমিদার শোভা সিংহ বিদ্রোহ করলে ইংরেজদের সাথে তার একটি সংঘর্ষ হয়। সে সময় ইংরেজদের অস্ত্রসস্ত্র তেমন কিছুই ছিল না। সুতরাং তাদের বেশ ক্ষতি হয়। আর তখনি লুটপাটে মায়াদের সেই প্রাচীন বইটি হারিয়ে যায়। এরপর ব্রোঞ্জের মাথাটিকে চার্লস আয়ার একটি কাঠের বাক্সের মধ্যে ভরে রাখেন।

এই ঝামেলার পর ইংরেজরা নিজেদের সুরক্ষার জন্য দুর্গ বানাল। রাজার নামে নাম দিল ফোর্ট উইলিয়াম।

কিন্তু সমস্যার শেষ ছিল না। বিভিন্ন দিকে সমস্যা শুরু হওয়ায় কোম্পানির একটি ছোট্ট দল গেল দিল্লীতে মোগল সম্রাটের সাথে কথা বলতে। সম্রাট তখন ফররুখশিয়ার। তিনি রাজপুত রাজার মেয়েকে বিয়ে করবেন। বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে এমন সময় সম্রাট অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

ভয়ানক অসুখ। রাজদরবারের চিকিৎসকেরা রোগ সারাতে ব্যর্থ হলেন সবাই।

ইংরেজ কোম্পানির ছোট দল তার সাথে দেখা করতে দিল্লীতে এসে বসে আছে জানতেন ফররুখশিয়ার। তিনি জানতে পারলেন তাদের সাথে একজন ডাক্তারও আছেন। সেই ডাক্তারকে ডাকা হলো।

ডাক্তার হ্যামিল্টন অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে এলেন রাজদরবারে। এর আগে এত ক্ষমতাবান কারো চিকিৎসা করেননি তিনি। কিন্তু অভিজ্ঞ হাতে বাদশাকে পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করে সে অনুযায়ী ওষুধ দিলেন। ছয় দিনের মধ্যে ফররুখশিয়ার সুস্থ হয়ে উঠলেন।

কৃতজ্ঞ সম্রাট ইংরেজদের সব দাবী দাওয়া শুনলেন।

এবং তাদের অবাক করে দিয়ে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ চব্বিশটি গ্রামের জমিদারী দিয়ে দিলেন।

ইংরেজ কোম্পানির উত্তরণ শুরু হলো।

আলীবর্দী খাঁ খান নবাব হলেন বাংলা বিহার ওড়িশার। রাজ্য তখন মারাঠাদের আক্রমণে বিপর্যস্ত। মারাঠা রাজা রঘুজি ভোসলা পাঠিয়েছিলেন তার সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে। অশ্বারোহী দুধর্ষ মারাঠারা লুটপাট চালাল রাজ্যে। ধনী জগৎশেঠের বাড়ী থেকে লুট করা হয়েছিল আড়াই কোটি টাকা।

ইংরেজদের তখন দূর্গ ছিল, কামান ছিল। এসবের ভয়ে মারাঠারা কলকাতায় তাদের আক্রমণ করতে সাহস

পায়নি। আর ইতিমধ্যে আলীবর্দী খান মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পন্ডিতকে আলোচনায় বসার আমন্ত্রণ জানালো।

ভাস্কর পন্ডিত আলোচনার জন্য আসলেন। তখন তাকে হত্যা করা হলো।

ভাস্কর পন্ডিতের মৃত্যুতে মারাঠারা দূর্বল হয়ে পড়লো। আর এদিকে ইংরেজ অধ্যুষিত কলকাতায় মারাঠারা আক্রমণ করতে পারেনি বলে তাদের সুনাম বেড়ে গেল।

আলীবর্দী খান মারা গেলে নবাব হলেন তার মেয়ের পুত্র সিরাজউদ্দৌলা। তরুণ এই নবাবের অপছন্দ ছিল ইংরেজদের। তিনি নবাব হবার কিছুদিন পরই দূত মারফত খবর পেলেন, ইংরেজরা তাদের কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গ এবং ফরাসিরা চন্দননগরে তাদের ফোর্ট অরলেঁয়া দূর্গ আরো শক্তিশালী করছে।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তিনি দূত পাঠালেন এই বলে, "যাও এই দুই বিদেশী গোষ্ঠিকে গিয়ে বলো দূর্গের কাজ বন্ধ করতে।"

দূত মারফত তিনি দুপক্ষকেই কাজ বন্ধ করতে নির্দেশ দিলেন।

ফরাসিরা মেনে নিল। তারা জানাল সামান্য সংস্কার কাজ করা হয়েছিল।

ইংরেজরা উল্টোদিকে বলল, "যেহেতু এখন দেশজুড়ে বিশৃঙ্খলা তাই তাদের শক্তি বাড়াতে হচ্ছে। এটি তাদের জন্য খুব প্রয়োজনীয়।"

নবাব ইংরেজদের উপর ক্ষেপে গিয়ে তাদের আক্রমণ করে বসলেন। নবাবের সৈন্যকে ঠেকানোর মত শক্তি ইংরেজদের ছিলো না। নবাবের সৈন্যরা দুর্গ ঘেরাও করে আক্রমণ করল। কোম্পানির কর্তাসহ কিছু ইংরেজ দুর্গের পশ্চিম দিকে হুগলি নদী দিয়ে পালিয়ে গেলেন।

নবাবের দূর্গ অধিকার, আক্রমণ ইত্যাদি বিশৃঙ্খলার মধ্যে ইংরেজ কোম্পানি কর্তার কাঠের বাক্সে রাখা সেই ব্রোঞ্জের মাথাটি হারিয়ে গিয়েছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

মং একজন বেটে লোক। তার নাক চ্যাপ্টা, চোখ ছোট। মারমা জনগোষ্ঠীর অন্য সদস্যদের মতই। কিন্তু তার সাহস এবং শক্তি প্রচন্ড। এই মিয়ানমার বাংলাদেশ সীমান্তে বসবাস করতে হলে এ দুটি জিনিসের খুব দরকার।

মিয়ানমার-বাংলাদেশের সীমান্তভূমির সীমানা চিহ্নিত নেই। অস্ত্রের চোরাচালান, মাদক ব্যবসার জন্য এ স্থানকে তাই স্বর্গরাজ্য বললে অত্যুক্তি হবে না। স্মল আর্মস সার্ভে ২০০১ অনুযায়ী এই অঞ্চলের অস্ত্রের জন্য বাংলাদেশ সবচেয়ে বড় ট্রানজিট পয়েন্টে অবস্থিত। অস্ত্র আসে আফগানিস্তান ও পাকিস্তান হয়ে, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মিয়ানমার, কম্বোডিয়া থেকেও আসে এদিক দিয়ে। এসব অস্ত্র এখান থেকে যায়ও বিভিন্ন দিকে। যেমন উত্তরে ভারতের বিদ্রোহীদের কাছে কিংবা উত্তর-পূর্ব বা দক্ষিণে এলটিটিইর কাছে।

সংঘর্ষ যেন লেগেই আছে এখানে সবসময়। মিয়ানমারের স্বাধীনতাকামী বিভিন্ন বিদ্রোহীদের সাথে (যেমন রোহিঙ্গা সলিডারিটি সংস্থা) মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর সংঘর্ষ চলছে। মাইন পুঁতে রাখা হয়েছে সীমান্তে

নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে। এসব পুঁতে রাখা বোমায় পা পড়লে রক্ষা নেই। বোমা বিদ্রোহী, শাসক কিংবা ধর্মযাজক কিছুই বুঝে না।

ফ্রু এই অঞ্চলে বসবাসরত মারমাদের একজন। চোরাচালানের সাথে সে বেশ ভালোভাবেই জড়িত। তার লোকবল এবং অস্ত্রশস্ত্রও আছে। বাংলাদেশের বর্ডার গার্ডের চোখ ফাঁকি দিয়ে অস্ত্র এবং মাদকদ্রব্যাদি নিয়ে এসে দেশের অভ্যন্তরে থাকা এজেন্টদের কাছে পৌঁছে দেয়া পর্যন্ত কাজ। সে চুক্তি ভিত্তিতে কাজ করে। সাধারণত চোরাকারবারীদের দালালরা তার সাথে যোগাযোগ করে থাকে।

ফ্রু চিন্তিত হয়ে বসে আছে কারণ সে খুব বড় এবং কঠিন একটি কাজ পেয়েছে। কাজটি হল ১৮ নং পয়েন্টের পাশের টিলার ধারে মিয়ানমার সীমান্ত থেকে একটি ছোট প্যাকেট আসবে। সেই প্যাকেট নিয়ে আসতে হবে। ব্যাপারটা কঠিন কারণ কাছেই বর্ডার গার্ডের অফিস। সাধারণত এত ছোট প্যাকেট এভাবে কখনও নিয়ে আসতে হয়নি। অনেক বড় বড় চালান সে নিয়ে এসেছে নৌপথে। এই কাজটি সে করত না। কিন্তু লোকটি অনেক টাকা দিয়েছে। সুতরাং কাজটি করে দিতে হবে। এছাড়া এই লোকটিই তাকে সবচেয়ে বেশি কাজ দেয় বছরে। অধিকাংশই মিয়ানমার থেকে আসা ইয়াবা ট্যাবলেটের

ডেলিভারি। সেগুলোতে ঝুঁকির পরিমাণ খুব কম কারণ ভেতরের দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ পথ দিয়ে সেসব আসে।

কালো আলখেল্লা পরিহিত লম্বা ধরনের লোকটির নাম কি সে জানে না। কিন্তু লোকটি কখনও কোন কাজে ঠকায়নি। এবং ফ্রুকে লোকটি খুব বিশ্বাস করে। বিশ্বাসের দাম দেয় ফ্রু। যদিও এই মৃত্যু উপত্যকায় বিশ্বাস একটি দুর্লভ জিনিস। এখানে যে যত বেশি মানুষকে বিশ্বাস করে সে তত তাড়াতাড়ি মারা যায়।

বর্ডার গার্ডের কড়াকড়ি বেড়েছে ইদানীং। সমুদ্রগামী চোরাকারবারীদের জাহাজ 'সম্রাট রাদানা' ধরা পড়ার পরেই এই অবস্থা। এছাড়া এই সীমান্তে প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যাওয়ার পর সবার দৃষ্টি পড়েছে এদিকে। মিয়ানমারের কাছ থেকে তেল, গ্যাস উত্তোলনের অনুমতি পেয়েছে ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া। এই গ্যাস আবার বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে নিয়ে যেতে পারলে ভারতের জন্য সাশ্রয়ী হয়। সুতরাং, বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে গ্যাস নেয়ার ট্রানজিট চায় ভারত। এসব নিয়ে বিভিন্ন আলাপ আলোচনার প্রেক্ষিতে এই সীমান্ত অঞ্চলের ভূ-রাজনীতি নতুন মাত্রা পেয়েছে। আর এখানকার চোরাচালান এবং তাতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত এই অঞ্চলের মানুষের কাজেও এসেছে পরিবর্তন। বেড়েছে সংঘর্ষ।

কালো আলখেল্লার মত একটি পোশাক পড়া লোকটি ফ্রু কে সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিল, "তুমি কি কাজটি পারবে? সোজা বাক্সটি নিয়ে আসবে আমার কাছে।"

ফ্রু বলেছিল, "পারবো। তবে বিশ হাজার টাকা লাগবে। গার্ডের অফিসের সাথে তাই রিস্ক বেশি।"

লোকটি সামান্য হেসে তার খয়েরী ব্যাগ থেকে দুটো টাকার বান্ডিল বের করে বলল, "এখানে ত্রিশ হাজার আছে। নিয়ে যাও। কাল রাতে আমাকে জিনিসটি দিয়ে যাবে।"

ফ্রু অবাক হয়ে টাকা হাতে নিতে নিতে বলেছিল, "ঠিক আছে।"

লোকটি তখন গম্ভীর গলায় বলেছিল, "জিনিসটি যদি ধরা পড়ে বা আমার হাতে না আসে, তাহলে সকালে তোমার লাশ পড়ে থাকবে নদীতে।"

এত দৃঢ়ভাবে লোকটি কথাটা বলল যে ফ্রু কোন উত্তর দিতে পারেনি। যদিও সে ভয় পায়নি। মৃত্যুকে কখনোই সে ভয় পায় না। কিন্তু লোকটাকে সেদিন তার অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। কাজের আগে পুরো টাকা দেয়ার নিয়ম নেই এখানে।

ফ্রু হাত ঘড়িতে তাকিয়ে দেখল রাত বারোটা। এখনি যেতে হবে টিলার ধারে। বর্ডার গার্ডের অফিসের পাশে দুটি সদস্যকে দেখা যাচ্ছে রাইফেল হাতে টহল দিচ্ছে। এছাড়া আশপাশে কোন মানুষজন নেই

ফ্রু ধীর পায়ে সুকৌশলে অন্ধকারের সাথে প্রায় মিশে বর্ডার গার্ডের অফিসের ঠিক পিছনে গেল। তার একটু বামে সেই টিলা। সেদিকে এগুনোর পর সে দেখতে পেল কাঠের একটি বাক্স পড়ে আছে নদী এবং টিলার মাঝখানে। বাক্সের কাছে পৌছানোর পর সে নদীতে তাকিয়ে দেখল ছোট একটি নৌকাতে করে একটা লোক চলে যাচ্ছে। অন্ধকারে লোকটাকে প্রায় দেখা যাচ্ছে না। তাকে দেখেই বাক্সটা ফেলে গেছে।

ফ্রু নিচু হয়ে বাক্সটাতে হাত দিতে যাবে এমন সময় একটি গুলি এসে লাগলো বাক্সটির গায়ে।

"হ্যান্ডস আপ, যেখানে আছো দাঁড়িয়ে থাকো" চিৎকার করে উঠল বর্ডার গার্ডের একজন সদস্য।

ফ্রু বুঝতে পারল পালানোর চেষ্টা করা বৃথা হবে। উল্টো প্রাণ যাবে। সে দাঁড়িয়ে রইলো। বর্ডার গার্ডের দুজন সদস্য কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "এই বাক্সের মধ্যে কি আছে?"

ফ্রু বলল, "জানিনা স্যার।"

বাক্সের মধ্যে বড় লোহার তালা দেয়া। বর্ডার গার্ডের একজন সদস্য গুলি করে তালাটি ভেঙ্গে ফেলল। আরেকজন ভেতর থেকে যে বস্তুটি বের করে আনল তা একটি ব্রোঞ্জের তৈরী মানুষের মাথা। চোখদুটি কোয়ার্টজের।

দুজন সদস্য ব্রোঞ্জের মাথা অর্থাৎ খুলিটাকে দেখছিল তৎক্ষণাত ফ্রুয়ের মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে তার পকেট থেকে রিভলবারটা বের করে দুটি গুলি ছুঁড়ল। একটা লাগল একজন বর্ডার গার্ড সদস্যের পায়ে আরেকটা আরেকজনের হাতে। তারা প্রায় ছিটকে পড়ল। সেই সুযোগে ফ্রু ব্রোঞ্জের মাথাটিকে নিয়ে দৌড়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

চতুর্থ অধ্যায়

লেখক আফসার উদ্দিনের কাছে আছে মায়াদের প্রাচীন একটি বই। তার পূর্বপুরুষ বর্ধমান থেকে এসেছিলেন বাংলাদেশে। তখন বইটি তার সাথেই ছিল। শোনা যায়, তার পূর্বপুরুষেরা বর্ধমানের জমিদার শোভা সিংহের দরবারে কাজ করতেন। যাইহোক, পুরুষানুক্রমে তারা এই পুস্তকখানি সংরক্ষণ করেছেন। এই বইটি কীভাবে তাদের কাছে এল আফসার উদ্দিন তা সঠিক জানে না। তার বাবা সাইফুদ্দিন আহমেদ যে রহস্যময় গুপ্ত সংগঠনের কথা বলেন তিনি তা কখনোই বিশ্বাস করেননি।

এখন আফসার উদ্দিন ঠিক করেছেন এই নিয়ে তিনি লিখবেন। তার বংশের সাথে প্রাচীন মায়াদের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। সে ইতিহাস ছড়িয়ে দেয়া তার কর্তব্য। কারণ পুস্তকটি তাকে অস্বাভাবিক কিছু ঘটনার মুখোমুখি করেছে। অবাস্তব এবং অতিপ্রাকৃতিক সেসব ঘটনায় ভয় পাননি তিনি। তবে তার কিছু ক্ষতি হয়েছে। এই বই সম্পর্কে কেউ জানত না। আফসার উদ্দিনও একা মানুষ ছিলেন। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, বই লিখে তিনি অনেক টাকা কামিয়েছিলেন। এছাড়া তার পৈত্রিক সম্পত্তির পরিমানও অনেক। যৌবনে বিয়ে করেননি। তাই একাই

ছিলেন। ভালোই দিন যেত তার। কিন্তু বার্ধক্যের সন্নিকটে এসে তার হঠাৎ বিয়ে করার শখ জাগলো। যে মেয়ের তিনি প্রেমে পড়েছিলেন সে বয়েসে অনেক ছোট তার। কিন্তু বিয়েটা হয়ে গেল। এই বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় টাকা এবং খ্যাতিই সব, আফসার উদ্দিন সেদিন নতুন করে বুঝতে পেরে আপন মনে হেসেছিলেন।

তার স্ত্রীর নাম শময়িতা চৌধুরী। নাম শুনলেই সৌমিত্র দেবের কবিতার কথা মনে হয়,

"পঙ্গু যোদ্ধার মতো উপরে দেখছি হাসি মলিন চাঁদের
অর্ফিয়ুসের পথ পেরিয়ে তবেই বাড়ি শময়িতাদের"

দেখতে সুন্দর এবং চটপটে। বিয়ের কয়েকদিনের মধ্যেই আফসার উদ্দিন আবিষ্কার করলেন বিয়ে করে তিনি ভুল করেননি। সুতরাং, বিয়ের পরও তার দিন ভালো যাচ্ছিল। তার স্ত্রী একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্কিওলজি বিভাগে পড়াশোনা করে। চতুর্থ বর্ষে। তার লেখার খুব ভক্ত ছিল। একবার তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে কি একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। তখন মেয়েটিকে দেখতে পান। খুব সম্ভবত সে সেদিন ব্যবস্থাপনার কোন দায়িত্বে ছিল। তার পাশে পাশে সারাক্ষণ ঘুর ঘুর করেছিল বেশ সুদর্শন একটি ছেলে। আফসার উদ্দিন লেখক মানুষ। চট করে বুঝে নিয়েছিলেন ছেলেটি মেয়েটির বয়ফ্রেন্ড বা এরকম কিছু।

সেদিন মেয়েটিকে তার ভালো লেগেছিল। তবে খুব বেশি ভালো যে এমন না।

কিন্তু এরপর মেয়েটি বার বার বিভিন্ন ছুঁতায় তার বাসায় আসতে লাগল। বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতে আসত। কয়েকটা ইন্টারভিউও নিয়েছে কীসব পত্রিকার জন্য। এক পর্যায়ে আফসার উদ্দিন মেয়েটির প্রতি দূর্বল হয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি কখনোই ভাবেননি বিয়ে করবেন বা এরকম কিছু। তিনি ভেবেছিলেন এসব ভাবনা মাথা থেকে দূরে সরানোর জন্য কিছুদিন কোথাও গিয়ে ঘুরে আসবেন।

কিন্তু তার এক বন্ধু বিষয়টা জানতে পেরে মেয়েটির বাবার কাছে প্রস্তাব নিয়ে যায়। আফসার উদ্দিন আক্ষরিক অর্থেই আকাশ থেকে পড়েছিলেন যখন শুনতে পারলেন মেয়েটির বাবা এবং মেয়েটি নিজেও বিয়েতে এক পায়ে রাজি। বিয়ের পর একবার স্ত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে দিতে গিয়ে তিনি আবার ঐ ছেলেটিকে দেখতে পান। একটা টঙ দোকানে বসে চা খাচ্ছে এবং তার দিকে তাকিয়ে আছে বিষদৃষ্টিতে।

আফসার উদ্দিনের একবার ইচ্ছা হল ছেলেটার পাশে গিয়ে বসেন। গিয়ে এক কাপ চা খেতে খেতে ছেলেটাকে বলেন, ভাইরে, জগতে টাকা আর খ্যাতিই সব। দুঃখ করে লাভ নেই। যা গেছে, গেছে। শেক্সপিয়ারই মার্চেন্ট অব ভেনিস- এ নারিসার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন- হ্যাংগিং এন্ড ওয়েভিং গোজ বাই ডেস্টিনি। অর্থাৎ বিয়ে আর মৃত্যু ভাগ্যের হাতে।

কিন্তু নিজের ইচ্ছাকে দমিয়ে রেখে বাসায় ফিরে আসেন। ইয়াং ছেলেপেলেদের বিশ্বাস নেই। প্রেমে ব্যর্থ ইয়াং ছেলে হচ্ছে খোঁচা খাওয়া বাঘ। স্বান্তনা দিতে গেলে লাফিয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া ছেলেটির দুঃখের কারণ তিনি নিজেই, একজন আপাদমস্তক বুর্জোয়া।

আফসার উদ্দিন স্ত্রীকে পুরাতন মায়াদের বইটা দেখিয়েছিলেন। সে তো দেখে ভীষণ অবাক। প্রথমে বিশ্বাসই করতে চায়নি সত্যি সত্যি এটি মায়াদের বই। সেই প্রথম আফসার উদ্দিনকে এই বই নিয়ে বই লেখার পরিকল্পনা দেয়। আফসার উদ্দিন তখন ভাবেন এবং বুঝতে পারেন এই বই যেহেতু তার কাছে সুতরাং একটা দায় তো আছেই। প্রাচীন মায়াদের অশ্রুত এক কাহিনী বিশ্বের কাছে প্রকাশ করার।

কিন্তু লিখতে বসেই নামে বিপত্তি। এই বই পড়ার জন্য অনেক আগেই প্রাচীন ইউকাটন পোপোলকা ভাষা তিনি শিখেছিলেন। বইটি কয়েকবার পড়েছেন। কিন্তু একে নিয়ে গল্প লিখতে গিয়ে কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে গেল। তিনি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়লেন। এরকম অবশ্য তার আগেও হয়েছে অনেকবার, তার স্কিজোফ্রেনিয়া আছে। কিন্তু এবারেরটা ভিন্ন।

রাতে ঘুমালে নাকি একা একা হাঁটেন। অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথা বলেন। শেষ পর্যায়ে এমন হল যে ঘুমন্ত অবস্থায় তিনি নাকি স্ত্রীর গলা চেপে ধরেন। একবার তো তার স্ত্রী

প্রায় মরতেই বসেছিল। সেদিন রাতের ভয়ার্ত চিৎকার চেঁচামেচিতে জড়ো হয়েছিল আশপাশের ফ্ল্যাটের লোকজন।

আফসার উদ্দিন এবং তার স্ত্রী দুজনেরই ধারণা ছিল এসব কিছু হচ্ছে বইটার কারণে। তার স্ত্রী বলেছিল বইটা যাদুঘরে দিয়ে দিতে কিংবা বিক্রি করে দিতে। কিন্তু তিনি রাজী হননি।

তারপর একসময় তার কাজকর্ম অসহনীয় হয়ে উঠল স্ত্রীর কাছে। বিচিত্র উদ্ভট সব পশুপাখির মৃতদেহ তিনি নাকি অন্যমনস্কভাবে কোথা থেকে তুলে এনে বিছানায় রাখেন। ঘুমাতে গেলে দেখা যায় রক্তমাখা বাদুড় কিংবা ইঁদুর পড়ে আছে বালিশের তলায়। তখন আবার নিজেই চমকে উঠেন ভয়ে।

ডাক্তার দেখিয়েও কাজ হয়নি। প্রকাশক তরিক আলী সাহেব বেশ কষ্ট করলেন। ডাক্তার বাসাতেও আনা হল। কিন্তু কোন কাজ হল না। এক ভারসাম্যহীন অবস্থায় নাকি তিনি চলে যাচ্ছেন।

এর মাঝে আরো একবার রাতে স্ত্রীর গলা টিপে ধরায় তার স্ত্রী পরদিন বাপের বাড়িতে গিয়ে উঠল। আফসার উদ্দিন পড়লেন বিপাকে।

তার স্ত্রী ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। সে বই শেষ করার জন্য বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে বইটা লিখে ফেলার পরামর্শ দিয়েছে। ডাক্তারও একই কথা বলেন। বইটা লিখে ফেললেই তিনি শান্তি পাবেন।

আফসার উদ্দিনেরও তখন মনে হল একমাত্র বইটা শেষ করতে পারলেই তিনি সব রকম ঝামেলা থেকে মুক্তি পাবেন।

তাই একটা ব্যাগে প্রাচীন সেই পুস্তক, কিছু কাগজ, তার লেখার জিনিসপত্র নিয়ে শহরের একেবারে শেষপ্রান্তে নদীর কাছে একটা নির্জন ভাঙ্গা বাড়িতে এসেছেন। পরিচিত কাউকেই জানাননি। শুধু তার স্ত্রীকে ছাড়া।

আফসার উদ্দিন পুরনো পুস্তকটা ব্যাগ থেকে বের করে ফুঃ দিয়ে এর উপর থেকে ধুলো ঝাড়ার চেষ্টা করলেন। তারপর ছোট জানালার কাছে ভাঙ্গা একটি ডেস্কে বসে পড়তে শুরু করলেন। লেখাগুলো তার খুব পরিচিত। অনেকবার পড়া। পড়তে পড়তে তিনি যেন সব নিজের চোখে দেখতে পান।

তাকে একটি ক্রুশে পেরেক গেঁথে ঝুলিয়ে দেয়া হল। ভয়ানক যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করে উঠলেন। বাহুতে এবং পায়ের গোঁড়ালিতে সাড়ে চার ইঞ্চি লম্বা পেরেক গাঁথা। পায়ের নিচে দেহের ভার রক্ষার জন্য দেয়া হয়েছে সাপোডিয়াম। সামনে দাঁড়ানো ভয়ংকর চেহারার দুটি লোক। তাদের গায়ে প্রাচীন এক ধরনের পোষাক, অনেকটা মোটা খয়েরী চাদরের মত। একটি লোক গম্ভীরভাবে বলে উঠল, "আপনাকে মহান পদ্ধতিতে হত্যা করা হচ্ছে। জানেন তো, এভাবে যিশুকে হত্যা করা হয়েছিল?"

যন্ত্রণায় কোন কথা বলতে পারলেন না তিনি। তাকে ঝুলানো হয়েছে উলঙ্গ করে। সুতরাং রোদের প্রবল উত্তাপে ঝলসে যাচ্ছে গা।

দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি বলল, "যিশুকে এভাবে মারা হয়েছিল। ক্রুশবিদ্ধ করে। এই যেমন পেরেক গেঁথে আপনাকে শুধু আটকে দেয়া হয়েছে তেমনি যিশুকে আটকানো হয়েছিল। আপনার মতই পায়ের নিচে পাপোডিয়াম দেয়া হয়েছিল তাকে দেহের ভার বহন করার জন্য। তার মৃত্যু যন্ত্রণাদায়ক দীর্ঘ ও দৃষ্ঠান্তমূলক করতেই এভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। এভাবে রাখলে মৃত্যু অনেকদিন পর্যন্তও দীর্ঘায়িত হয়। তখন ঝুলন্ত ব্যক্তি মারা যায় ক্ষুধা তৃষ্ণায় ছটফট করতে করতে। ধারণা করতে পারেন যিশু কীভাবে মারা গিয়েছিলেন?"

তিনি কোন কথা বলতে পারলেন না। তাকিয়ে রইলেন যন্ত্রণাকাতর মুখে।

লোকটি বলল, "যিশুকে চাবুক মেরে রক্তাক্ত করা হয়েছিল। তখন আবার পাসওভার উৎসব শুরু হবে। তাই মৃত্যু দীর্ঘায়িত করা হয়নি। ঝুলন্ত অপরাধীর পা ভেঙ্গে দিলেই হয়। দেহের ভারে দশ মিনিটের মধ্যে মৃত্যু। যিশুর ক্ষেত্রে পা ভাঙ্গতে গিয়ে দেখা যায় তিনি অজ্ঞান। তখন তার পেটে আঘাত করা হয় বর্শা দিয়ে।"

সামনে দাঁড়ানো লোকদুটিকে ঝাপসা ঝাপসাভাবে দেখা যাচ্ছে। রোদের তেজ প্রচন্ড।

তিনি কিছু বলতে মুখ খোললেন। কিন্তু বলার মত শক্তি তার ছিল না। শুধুমাত্র ঠোঁট দুটি সামান্য নড়ে উঠল।

সামনের একটি লোক বলল, "তবে আপনাকে আমরা ঠিক ওভাবে মারতে পারছি না। স্যরি। কারণ আমাদের কাছে চাবুক নেই, বর্শাও নেই। পা ভাঙ্গার যন্ত্রও নেই। আর এই বালুকা-প্রান্তরে এসব পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনাও নেই।"

ক্রুশে ঝুলন্ত অবস্থায় তিনি মাথা ঘুরিয়ে দেখলেন এক বিস্তীর্ণ মরুভূমি চারিদিকে।

সামনের লোকটি বলে যাচ্ছিল, "তাই কি আর করা! আপনাকে এভাবে ঝুলিয়ে রেখে আমরা বিদায় নিব। আর আপনি ধীরে ধীরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবেন। সেই মহান, দূর্বোধ্য, চিরকালের বিস্ময় মৃত্যুকে।"

লোকদুটি শব্দ করে হাসতে শুরু করল। তাদের হাসির শব্দ যেন ধারালো ছুরি হয়ে কানে এসে প্রবেশ করছে। তার মনে হল মাথাটা কেটে সমস্ত মগজ কুচি কুচি হয়ে যাবে এই শব্দে। তিনি আর্তনাদ করে সর্বশক্তি দিয়ে দু হাতে কান চাপতে চাইলেন।

আর ঠিক তখনি তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি দেখলেন সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেছে। তিনি খাট থেকে মেঝেতে পড়ে গেছেন।

মেঝেতে থেকে তিনি উদ্ভ্রান্তের মত হাতরে খাটের পাশের ছোট টেবিলটা থেকে তার চশমা খুঁজে নিলেন।

চশমা চোখে দিয়ে তার প্রথম যে জিনিসটা চোখে পড়ল তা হল জানালার পাশে রাখা লেখার টেবিলের উপর একস্তুপ কাগজ এবং একটি কাগজে লেখা তার নিজের নামঃ আফসার উদ্দিন।

মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কাগজপত্র। তার হাতে ধরা মায়াদের সেই প্রাচীন বইটি। এটি পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তিনি ঘুমিয়ে দেখেছেন ভয়ানক দুঃস্বপ্ন। এরকম কিছু দুঃস্বপ্ন তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

এর কিছুক্ষণ পর দরজায় ঠক ঠক শব্দ হল। আফসার উদ্দিন চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখলেন দাঁড়ানো এক লোক। মুখে খোঁচা খোঁচা কাঁচা পাকা দাড়ি। পাকার অংশই বেশি। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। পরনে পাতলা মেটে রঙের পাঞ্জাবী।

আফসার উদ্দিন জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কে?"

লোক মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "স্যার আমি এই আপনার পাশের ভাঙ্গা গ্যারেজটায় থাকি। গতকাল দেখলাম আপনি এখানে এসেছেন। তাই দেখা করতে এলাম। আমার নাম পলোনিয়াস। আপনি ডাকতে পারেন পলু বলে।"

আফসার উদ্দিন বললেন, "ভেতরে আসুন।"

লোকটি ভেতরে এসে খাটে বসল। আফসার উদ্দিন বসলেন চেয়ারে। লোকটি জিজ্ঞেস করল, "তা আপনি কি করেন?"

আফসার উদ্দিন বললেন, "আমি একজন লেখক।"

লোকটা মুখে কৌতুহল ফুটিয়ে বলল, "এই উপন্যাস টুপন্যাস?"

আফসার উদ্দিন বললেন, "শুধু উপন্যাস।"

লোকটা বলল, "তাহলে আপনাকে বলা যায় আমার গল্পটা। বুঝলেন স্যার, আমার জীবনের দারুণ এক গল্প। বললে বিশ্বাস করবেন না।"

আফসার উদ্দিন উদাস মুখে বললেন, "বলতে চাইলে বলে যান।"

লোকটি বলল, "তাহলে শোনেন। আমি তখন সবে চাকরিতে যোগ দিয়েছি।

নতুন জায়গায় চাকরি। জায়গার নামটা বলব না। বিশেষ কারণেই গোপন রাখতে হচ্ছে। আশা করছি এতে আপনি কিছু মনে করবেন না?"

আফসার উদ্দিন বললেন, "কিছু মনে করব না। আপনি বলে যান।"

লোকটি বলতে লাগল, "এলাকায় আসার পর এদের সাথেই আমার প্রথম পরিচয় হয়। বাবা এবং মেয়ে। মেয়েটার বয়স তিন বা চার হবে। বাবা প্রায় আমার বয়েসী। পয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ। খুব অভিজাত পরিবার। আলিসান বাড়ি। কি একটা পারিবারিক ঝামেলার কারণে বাড়ির গৃহকর্ত্রী অর্থাৎ মেয়েটির মা এবং লোকটির স্ত্রী বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। লোকটি আমাকে কখনও কারণটি

বলেনি। আমিও কখনও জিজ্ঞেস করিনি। কারো ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে বিশেষত সে যদি না প্রকাশ করতে চায় তাহলে আমার কোন আগ্রহ্ নেই। এমনিতে আমার নিজের জীবনই বেশ জটিলতাপূর্ণ।

আমি ওদের ওখানে যেতাম মাঝে মাঝে। লোকটি শিল্প, সাহিত্য, দর্শনের সমঝদার। এরকম লোক সচরাচর দেখা যায় না। নীৎসে, কান্ট, হেগেল, শ্লেগেল নিয়ে প্রায়ই আমাদের আলোচনা হত। মেয়েটিও ছিল খুব মিষ্টি। সে তার ছোট পুতুলটি নিয়ে খেলায় ব্যস্ত থাকত বেশিরভাগ সময়।

সেদিন সকালে হতদন্ত হয়ে লোকটি এল আমার কাছে। আমি তখন বেরোনোর প্রস্তুতি নিচ্ছি।

এসে বিষন্ন মুখে বলল, "ভাই, বড় ঝামেলায় পড়ে গেছি।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কি ঝামেলা?"

লোকটি বলল, "আমার মেয়েটা কাঁদছে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেন? কি হয়েছে?"

লোকটি বলল, "না মানে...ওর পুতুলটা আমি কেটে ফেলেছিলাম। তাই কাঁদছে।"

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "পুতুল কাটলেন কেন? আচ্ছা, নতুন আরেকটা কিনে নিয়ে বাসায় চলে যান।"

লোকটি বলল, "কিন্তু নতুনটা তো আমার মেয়েটার মতো হবে না। ওটাতো অন্য আরেকটা হবে।"

আমি বিরক্তমুখে বললাম, "তাহলে কি করতে চান?"

লোকটি বলল, "আপনি একটু চলুন না। আমার মেয়েটি আপনাকে বেশ পছন্দ করে। আপনাকে দেখলে কান্না থামাবে।"

আমি বিরক্ত হলেও লোকটির সাথে চললাম তার বাড়িতে। গিয়ে দেখি বসার কক্ষের মেঝেতে পুতুল পড়ে আছে। তার পাশে পড়ে আছে লোকটির মেয়ে। মাথা কাটা অবস্থায়। কার্পেট রক্তে ভেসে যাচ্ছে। আমার হৃদস্পন্দন বন্ধ হবার উপক্রম হল।

লোকটার মুখভঙ্গির কোন পরিবর্তন হল না। সে আগের মতই প্রায় কাঁদো কাঁদো মুখ করে বলল, "দেখছেন, আমার মেয়েটা কাঁদছে।"

আমি পুলিশে খবর দেই। লোকটিকে পুলিশ যখন ধরে নিয়ে যায় তখন তার মুখে ছিল "হতবিহ্বল" দৃষ্টি। যেন সে বুঝতে পারছে না কেন তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

যাবার সময় লোকটি পুলিশের গাড়ি থেকে আমার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলেছিল, "ভাই, আমার মেয়েটাকে একটু দেখে রাখবেন।"

এই হল গল্প। একেবারে সত্যি। আপনার নিশ্চয়ই বিশ্বাস হচ্ছে না?"

আফসার উদ্দিন গম্ভীর মুখে বললেন, "ঠিক বলেছেন। বিশ্বাস হয় নাই। আপনি চলে যান। আমি এখন লেখতে বসবো।"

লোকটি বলল, "স্যার, আরেকটু বসি? আসলে আমিও খুব ব্যস্ত। বিশ্বাসী লোক পাওয়া যায় না। তাই কারো সাথে কথাও বলি না। আপনাকে দেখেই মনে হয়েছে আপনি অন্য জাতের লোক। শিল্প আপনিই বুঝতে পারবেন।"

আফসার উদ্দিন বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, "আপনি কি করেন?"

লোকটি একটু ঝুঁকে এসে বলল, "অত্যন্ত গোপন এক কাজ স্যার। এজন্য আমাকে গোরস্থানে গোরস্থানে ঘুরতে হচ্ছে। আপনাকে একদিন নিয়ে দেখাব আমার কাজ। শিল্প আপনি বুঝতে পারবেন।"

আফসার উদ্দিন বললেন, "আচ্ছা ঠিক আছে। তবে এখন আমি লেখা নিয়ে ভাবছি। তাছাড়া আমি অসুস্থও কিছুটা। সুতরাং পরে কথা হবে।"

আফসার উদ্দিন ভেবেছিলেন লোকটি উঠতে চাইবে না। কিন্তু দেখা গেল সে সাথে সাথেই উঠে দরজার কাছে চলে গেল। দরজায় গিয়ে আফসার উদ্দিনের দিকে তাকিয়ে বলল, "স্যার, আপনি কি জোসেফ কনরাডের লেখা পড়েছেন?"

আফসার উদ্দিন বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, "না, পড়িনি।"

লোকটা বলল, "ভদ্রলোক একটা দারুণ কথা বলে গেছেন, Ò True terror is the kind that men feel toward their imagination. Ó

এই কথা বলে লোকটি চলে গেল।

লোকটাকে বিদায় করে দিয়ে আফসার উদ্দিন যখন লিখতে বসার জন্য টেবিলে বসেছেন ঠিক তখন তার মোবাইল ফোনের রিংটোন বেজে উঠল।

তিনি ফোন রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে একটি গাঢ় কণ্ঠ জিজ্ঞেস করল, "স্যার কেমন আছেন?"

"ভালো আছি। কে বলছেন?"

"জ্বী স্যার আমি হায়দার আলী। শিরোনাম প্রকাশনের মালিক। প্রকাশক, চিনতে পেরেছেন স্যার?"

"আচ্ছা, বলেন কি দরকার?"

"স্যার, আমাকে এবার একটা বই দিতে হবে। থ্রিলার উপন্যাস।"

"থ্রিলার কেন?"

"স্যার, থ্রিলারের মার্কেট ভালো। পাবলিক খায় বেশ। এজন্যই থ্রিলার চাইতেছি।"

বিরক্ত কণ্ঠে আফসার উদ্দিন বললেন, "আচ্ছা, কি ধরনের থ্রিলার খোলাসা করে বলেন। আপনার পাঠক কোন ধরনের থ্রিলার খায় তা তো আমি জানিনা। শেষে দেখা যাবে এমন থ্রিলার লিখেছি পাঠক মুখে দিয়েই বলছে থুঃ"

হায়দার আলী মনে হল এ কথায় বেশ মজা পেলেন। তিনি হো হো শব্দে হাসলেন।

তারপর বললেন, "স্যার ঐতিহাসিক থ্রিলার দেন। আপনি যেরকম ওয়ান বাই ওয়ান প্রকাশনীর জন্য লিখছেন মায়া সভ্যতা নিয়ে। ওরকম একটা ক্ল্যাসিক।"

আফসার উদ্দিন বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি ওয়ান বাই ওয়ান প্রকাশনের জন্য ঐতিহাসিক থ্রিলার লিখছি আপনি কীভাবে জানলেন?"

"স্যার, এটা তো সারাদেশ জানে। আপনি মায়া সভ্যতা নিয়ে তরিক আলী সাহেবের প্রকাশনীর জন্য থ্রিলার লিখছেন। উনি আপনার জন্য বান্দরবানে নির্জন একটা বাংলোর ব্যবস্থা করেছেন। সেখানে আপনার সাথে তার মেয়েও থাকছে। উপজাতিদের কি নিয়ে যেন রিসার্চ করছে। আপনি বলেছেন পরের থ্রিলার ওকেই উৎসর্গ করবেন।"

আফসার উদ্দিন যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, "এসব আপনি কীভাবে জানলেন?"

"স্যার, কী যে বলেন না। আপনার ইন্টারভিউ পত্রিকায় বেরোলে আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ি। আমি স্যার আপনার একজন বিরাট ফ্যান। গত সপ্তাহে দৈনিক সত্যানুসন্ধানের সাহিত্য পাতায় আপনার ইন্টারভিউটা মিস করব কীভাবে ভাবলেন?"

আফসার উদ্দিন ফোন কেটে দিলেন। তারপর বসে দীর্ঘক্ষণ সমস্ত ব্যাপারটা মনে করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু

কিছুই তার মনে আসছে না। তিনি মারাত্মক ভয় পেলেন। এরকম ব্যাপার তার আরো দু'বার হয়েছে। দু'বারই সামান্য সময়ের জন্য সম্পূর্নভাবে তিনি সবকিছু ভুলে গিয়েছিলেন। সে এক ভয়াবহ অবস্থা। ভাবলেই গায়ের রোম খাড়া হয়ে যায়। ভয়ে আফসার উদ্দিনের গলা শুকিয়ে গেল। তাহলে তিনি কি আবার এরকম অবস্থায় পড়তে যাচ্ছেন?

তিনি মোবাইল হাতে নিলেন কয়েকটা ফোন করার জন্য। কিন্তু মোবাইলে দেখলেন কোন নাম্বার সেভ করা নেই। মুখস্থ ছিলো না কোন নাম্বার। কিন্তু নাম্বার ডিলিট হল কীভাবে মোবাইল থেকে? আফসার উদ্দিন তাও মনে করতে পারলেন না।

আফসার উদ্দিন ঘামছিলেন দরদর করে। তখন তার মোবাইলে আরেকটি ফোন এল। তিনি ভয়ে ভয়ে রিসিভ করে বললেন, "হ্যালো?"

"আফসার? তুই এইটা কি করলি?"

"কে বলছেন?"

"আরে ব্যাটা আমি আলামিন। তোর বন্ধু, পুলিশের সাবইন্সপেক্টর। তুই এইটা কি করলি? তরিক আলীর মেয়েকে খুন করলি কেন?"

"খুউউন!"

"হ্যাঁ। টাকা কয়েক লাখ নিয়েছিস তাতে খুব একটা সমস্যা হত না। কিন্তু মেয়েটাকে খুন করলি কেন? আমি তো ভাবতেই পারছি না।"

আফসার উদ্দিন কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, "বন্ধু আলামিন, আমি কিছুই মনে করতে পারছি না।"

"মনে করতে পারছিস না মানে? পত্রিকায় এসেছে। সারা দেশ জানে না। এখন কি করবি? পুলিশ তো খোঁজা শুরু করবে।"

আফসার উদ্দিন কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, "কি করব? তুই বলে দে ভাই?"

"তুই এখন কোথায়?"

"আমি শহরের প্রান্তে এক ভাঙ্গা বাড়িতে। নদীর পাড়ে।"

"ওকে তুই কোন চিন্তা করবি না। আমি একটা লোক পাঠাচ্ছি। সে আজ বিকেলে ভাঙ্গা বাড়ির সামনে থাকবে। তাকে নিয়ে নদী পাড় হয়ে গ্রামে চলে যাবি। আর কেন খুন করেছিস সে ব্যাপারে বিশ্বাসযোগ্য একটি গল্প বানিয়ে ফেল। আমি দেখছি এদিকে কি করা যায়।"

"কিন্তু এতক্ষণ কি করব?"

"ঘরে থাক। ঘর থেকে বের হবি না। নিউজ পত্রিকায় চলে এসেছে। কেউ দেখতে পারলে সমস্যা।"

আফসার উদ্দিন বন্ধুর সাথে ফোনে কথা বলে আরো বিধ্বস্ত অনুভব করলেন। তার মাথা ঘুরতে শুরু করল। পত্রিকার কথা মনে পড়াতে তিনি দরজার দিকে তাকালেন। সেখানে সকালের পত্রিকা পড়ে আছে।

আফসার উদ্দিন হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে পত্রিকাটি হাতে নিলেন।

প্রথম পাতাতেই খবরটি তার চোখে পড়লঃ

"প্রকাশকের মেয়ে খুনঃ লেখক আফসার উদ্দিন নিরুদ্দেশ" ।

ডেস্ক রিপোর্টঃ ওয়ান বাই ওয়ান প্রকাশনীর মালিক তরিক আলী হাওলাদারের তরুণী মেয়েকে খুন করে এবং বই দেবার নাম করে আগাম কয়েকলাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে দেশের বিখ্যাত লেখক আফসার উদ্দিন এখন পলাতক আছেন। উল্লেখ্য বরেন্য লেখক আফসার উদ্দিন দেশ বিদেশের অনেক পুরষ্কারপ্রাপ্ত একজন সাহিত্যিক। এই ঘটনায় হতাশ এবং ক্ষুব্ধ তার ভক্তরা। লেখকের স্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন- উনার সাথে তিনমাস ধরে আমার কোন সম্পর্ক নেই। পুলিশ জানিয়েছে খুনের মোটিভ ঠিক বুঝা যাচ্ছে না। লেখকের কিছু মানসিক অসুস্থতা ছিল। পুলিশ তাকে ধরার সর্বাত্নক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আফসার উদ্দিনের মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তা বন্ধ পাওয়া যায়।

আফসার উদ্দিনের মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। তার চোখে ভাসতে লাগল অন্ধকারে এক কালো দেবীর মুখ। মুখটি ভেঙ্গে গেছে। মনে হচ্ছে দেবী তার ধারালো দাঁত বের করে হাসছেন। আফসার উদ্দিন বহুকাল আগে এক রাতের অন্ধকারে সেই মূর্তিটি দেখেছিলেন। সে রাতেই প্রথমবারের মত তিনি অজ্ঞান হন এবং সেখান থেকেই তার অসুস্থতার শুরু।

আফসার উদ্দিনের শরীর কাঁপতে শুরু করল। কিন্তু তিনি মাথা ঠান্ডা রেখে বিছানায় গিয়ে শুয়ে রইলেন। বিকেল পর্যন্ত তার অপেক্ষা করতে হবে।

বিকেলে একটি মধ্যবয়স্ক লোক এসে আফসার উদ্দিনকে জাগালো। ধাতস্থ হতে লেখকের বেশ সময় লাগলো। তার অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। লোকটি তাকে নৌকায় করে নদীর অন্য পাড়ে একটা গ্রামে নিয়ে গেল। তখন অন্ধকার নেমে এসেছে।

লোকটি বলল, "স্যার, আমার কাজ ছিল আপনাকে গ্রাম পর্যন্ত এনে দেয়া। এখানে আপনার কোন সমস্যা হবে না।"

আফসার উদ্দিনকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে লোকটি আবার অন্য নৌকায় উঠে চলে গেল।

গ্রাম বেশ নিরব। অন্ধকার যেন আলকাতরার মত। আফসার উদ্দিন সেই অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তার কাঁধে একটি ব্যাগ।

কোথায় যাবেন, কি করবেন এবং যে অদ্ভুত পরিস্থিতিতে পড়েছেন তা থেকে কীভাবে উদ্ধার পাবেন এসব ভাবতে ভাবতে তিনি হাটছিলেন। তার মাথা যেন ঠিকমত কাজ করছিল না। এখনো তার কিছুই মনে পড়ছে না। কেন তিনি খুন করলেন? কখন?

অন্ধকারে পিছন থেকে খসখসে কণ্ঠে কে যেন জিজ্ঞেস করল, "আপনে কেডা?"

আফসার উদ্দিন পিছনে তাকিয়ে দেখলেন বৃদ্ধমতন এক লোক। হাতে হারিকেন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আফসার উদ্দিন বললেন, "আমি এখানে নতুন এসেছি...একটা কাজে। কিছুই চিনিনা।"

লোকটা বলল, "এইডা কুনু বেপার না। চিনেন না, চিনবেন। আপনের বাড়ি কই?"

আফসার উদ্দিন বললেন, "চাপাইনবাবগঞ্জ।"

লোকটা জিজ্ঞেস করল, "এইখানে আসছেন কেন? মতলব কি? এইখানে রাতে দুই ধরনের মানুষ আসে। কিছু দুই নাম্বারী কাজে। আপনাকে দেখে তো তেমন মনে হয় না। আপনে কি অসুস্থ?"

আফসার উদ্দিন বললেন, "জ্বী ভাই। আমার বোধহয় জ্বর আসবে। আর আমি কোন মতলবে আসিনি।"

লোকটা বলল, "তাইলে মনে অয় গ্রামের সুন্দর দেখতে আইছেন। কিন্তু যারা আসে তারা তো দিনে আসে। এই পাড় থিকা নদী দেইখা সন্ধ্যার আগেই চইল্যা যায়। আপনে সুন্দর দেখতে আইলে একটা কথা কই আপনেরে। সুন্দর দেইখা কখনও পেট ভরে না। আল্লা সুন্দররে পেট ভরানোর ক্ষমতা দেন নাই। বুঝলেন কিছু?

আফসার উদ্দিন কিছু বুঝতে পারেননি। তাই হতবুদ্ধির মত মাথা নাড়লেন।

লোকটা বলল, "বুঝছি। বুঝতে পারেন নাই। টেকাটুকা আছে কিছু সাথে?"

আফসার উদ্দিন বললেন, "হ্যাঁ। আছে।"

লোকটা বলল, "আমার বাড়িতে থাকতে পারবেন। আমি থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা কইরা দিব। দিনে দিবেন দুইশ টেকা। রাজি তো?"

আফসার উদ্দিন মাথা নেড়ে জানালেন তিনি এই প্রস্তাবে রাজী।

লোকটা বেশ খুশি হল। আফসার উদ্দিনকে বলল, "চলেন তাইলে আমার সাথে। আমার নাম আব্দুল করিম। লোকে ডাকে করিম মিয়া কইয়া। অনেকে কয় করিম চৌকিদার। আপনে আমার বাড়িতে থাকবেন, খাইবেন আর আর ভরা পেটে দিনে সুন্দর দৃশ্য দেখবেন। খালি পেটে দেখলে গেষ্টিক অয়।"

একটা বড় বটগাছের পাশ দিয়ে তারা হেটে যাচ্ছিলেন। বটগাছ পার হতেই কে একজন কর্কশ গলায় হুংকার দিয়ে উঠল, "ঐ খাড়া তোরা। এদিকে আয়!"

করিম মিয়া আফসার উদ্দিনকে সাথে নিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবে বটগাছের নিচে আসলো। বটগাছের নিচে একটা মশাল জ্বলছে। তার পাশে কালো কাপড়ে আপাদমস্তক ঢাকা এক বিশালাকার লোক বসে আছে। তার মুখে বিচিত্র সব উল্কী আঁকা।

করিম মিয়া আফসার উদ্দিনের কানে মুখ নিয়ে আস্তে করে বলল, "ইনি আমগো গেরামের উজা।"

তারা দুজন যখন ওঝা লোকটির কাছে পৌছল তখন লোকটি গমগমে কণ্ঠে বলল, "করিম তুই দূরে গিয়া খাড়া। এই লোকের সাথে আমার পেরাইবেট কথা আছে।"

করিম মিয়া দূরে গিয়ে দাঁড়াল।

কালো কাপড়ে ঢাকা লোকটি আফসার উদ্দিনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। আফসার উদ্দিনের অদ্ভুত লাগছিল। তার তখন মায়ান শামানদের কথা মনে হচ্ছিল। যে শামানরা আত্মাদের সাথে যোগাযোগ করে মানুষের ভালো কিংবা মন্দ করার ক্ষমতা রাখে। তিনি কিছু বলার আগেই লোকটি শান্তস্বরে বলল, "আফসার মিয়া, লেখক হইয়া এইডা কি কাম করলা? খুন কইরা ফেললি ব্যাটা বদ?"

ভয়ে আফসার উদ্দিনের মুখ শুকিয়ে গেল। তার মনে হল দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া উচিত এখান থেকে। কিন্তু পালিয়ে যাবেন কোথায়? চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার।

আফসার উদ্দিনের ভয়ার্ত মুখ দেখে লোকটা মুচকি হেসে বলল, "চিন্তা করিস না বেটা। আমার কাম কইরা দে। কেউ তোর কোন ক্ষতি করতে পারব না।"

কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে আফসার উদ্দিন জিজ্ঞেস করলেন, "কি কাজ?"

লোকটা খসখসে গলায় বলল, "বড় গুরুত্বপূর্ণ কাম। আমি বহুদিন ধইরা তোর অপেক্ষায় আছি রে পাগলা। তুই আমার জীবনিতিহাস লেখবি।"

আফসার উদ্দিন বললেন, "কিন্তু আমি তো আপনার সম্পর্কে কিছু জানিনা ।"

গমগমে কণ্ঠে লোকটা বলল, "বান্দির পুত, না জাইনা তোরে লেখতে কইছি আমি? হাউয়ার পো হাউয়া, আমি নিজেই লেইখা রাখছি । তুই তা পইড়া আবার লেখবি । লেখকের জায়গায় দিবি আমার নাম, ফকির ইনিচ ইয়াশ ফুক মো!

আফসার উদ্দিনে ঝট করে উঠে পড়লেন । হঠাৎ করেই যেন তিনি সমস্ত পরিস্থিতির কথা ভুলে গেলেন । লেখালেখি তার প্রবল এক আত্মসম্মানের জায়গা । সেই লেখালেখিতে গ্রামের এক ভন্ড ওঝার আদেশ তিনি মানতে পারেন না ।

তিনি রাগী কণ্ঠে বললেন, " আমি পারব না ।"

ওঝা যেন খুব অবাক হল । সে চারপাশে তাকাল একবার ।

খসখসে কণ্ঠে বলল, "কয় কি! বান্দির পোলায় কয় কি ।"

আফসার উদ্দিন হাটতে লাগলেন । এই লোকের সামনে থাকা সম্ভব না । তিনি যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন লোকটি বলছিল, " যা যা! তবে আমার কাছে তোর আইতে হইবে ।"

আফসার উদ্দিন করিম মিয়ার সাথে হেটে তার বাড়িতে গেলেন । ছোট টিনের বাড়ি । কিন্তু বেশ সাজানো গুছানো । বাইরে থেকে দেখলে ভিতরটা যে এত পরিপাটি তা বুঝা যায় না ।

করিম মিয়া এবং তার স্ত্রী এই দুজন মাত্র মানুষ। করিম মিয়া প্রায় বৃদ্ধ কিন্তু তার স্ত্রীর বয়স অল্প। করিম মিয়ার স্ত্রীকে দেখে আফসার উদ্দিনের চার্ণক্যের একটা শ্লোক মনে পড়ল- 'বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা বিষতুল্য।'

খাবার পর আফসার উদ্দিন ঘুমাতে গেলেন। তাকে ঘুমানোর জন্য ছোট একটি ঘর দেয়া হয়েছিল। ছোট হলেও চমৎকার। আফসার উদ্দিন ক্লান্ত ছিলেন এবং তিনি অনুভব করছিলেন যে তার জ্বর আসছে। খুব তাড়াতাড়িই তিনি ঘুমিয়ে পড়েন।

কতক্ষণ তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন জানেন না। হঠাৎ বুঝতে পারলেন একজোড়া ঠান্ডা হাত তার গলা চেপে ধরে আছে। তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি তার গলায় শক্ত করে চেপে ধরা হাত ছুটাতে চাইলেন। তার দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল। আফসার উদ্দিন সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করে হাত দুটি তার গলা থেকে ছুটালেন।

তার সমস্ত শরীর ঘেমে গেছে। তিনি দ্রুত নিঃশ্বাস নিতে নিতে মুখের ঘাম মুছে পাশে থাকাতেই আর্তনাদের মত শব্দ করে উঠলেন। একটি মহিলা জিভ বের করে মরে পড়ে আছে। মুখ দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে।

আফসার উদ্দিনের মাথা ঘুরে গেল। তিনি মেয়েটাকে চিনতে পেরেছেন। এই মেয়েটিই করিম মিয়ার স্ত্রী। কিন্তু এখানে এল কেমন করে?

আতংকে রক্ত হিম হয়ে গেল আফসার উদ্দিনের। তিনিই কি একে গলা চেপে ধরে খুন করেছেন? লোকজন জেনে যাবে সকালে, তখন কি হবে? করিম মিয়া জানতে পারলে কি করবে?

আফসার উদ্দিনের মনে হল এসব চিন্তা করার সময় না এখন। পালাতে হবে। তিনি দরজা খুলে অন্ধকারে দৌড়াতে লাগলেন।

আতংকের দৌড়। অন্ধকারে কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা দৌড়। দৌড়াতে দৌড়াতে একসময় ক্লান্ত হয়ে তিনি একটি গাছের কাছে এসে উল্টে পড়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

একসময় শুনতে পেলেন ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠ, " এসেছিস তাইলে। আমার ডাক না হুইন্যা ঘুমাইয়া রইবি?"

দুর্বল, ভীত ও ক্লান্ত আফসার উদ্দিন মাটি থেকে মাথা তুলে তাকিয়ে দেখলেন কালো পোষাক পড়া বিশালাকার লোকটি গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

লোকটা বলল, "উইঠা বয়। আর এইটা নে।"

লোকটার কথামত উঠে বসলেন আফসার উদ্দিন। হাঁটুগেড়ে বসে লোকটির হাত থেকে পুরনো এক তাড়া কাগজ নিলেন।

লোকটা বলল, "খুইল্যা দ্যাখ।"

আফসার উদ্দিনের পুরনো কাগজগুলো খুলে দেখলেন। তখন শেষরাত। চারিদিকে নিস্তব্ধতা। লোকটির বাম হাতে

একটি মশাল। মশালের আলোতেই আফসার উদ্দিন দেখলেন কাগজে হিজিবিজি কীসব লেখা। এক বর্ণও বুঝা যায় না।

লোকটা বলল, "কি রে বুঝা যায় না কিছু?"

আফসার উদ্দিন ভয়ার্ত কণ্ঠে বললেন, "না।"

লোকটা বলল, "তাইলে সেইটা বলবি না? ইদিকে আয়।"

আফসার উদ্দিন ভয়ে ভয়ে একটু এগিয়ে গেলেন। মুহূর্তের মধ্যে লোকটি ঠাশ করে একটা চড় বসিয়ে দিল তার গালে। এত জোরে যে তিনি মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। রাত্রির অন্ধকারে যেন এই চড়ের শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

আফসার উদ্দিনের মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল।

লোকটা বলল, "উইঠা বয়। এইগুলা নাহোয়াতি ভাষায় লেখা। তুই বুঝতিনা। তাই চড় দিলাম। এখন বুঝবি। এখন দেবীর আশীর্বাদ নে।"

একটি ভয়ংকর দাঁত বের করা কালো মূর্তিকে আফসার উদ্দিনের সামনে তুলে ধরল লোকটি। মূর্তিটির মুখের দিকে তাকিয়ে আফসার উদ্দিনের সারা শরীর কাঁপতে শুরু করল। এরকম একটি মূর্তি তিনি আগেও দেখেছেন। এক অন্ধকার রাতে এরকম একটি দেবী মূর্তি দেখেই তিনি ভয় পেয়েছিলেন। অন্যভূবন থেকে আগত ব্যাখ্যাতীত কিছু ভয়। সেদিনই তিনি প্রথম অজ্ঞান হন। মূর্তিটি দেখে তার

মুখ দিয়ে লালা বের হতে লাগল। তার চারদিক যেন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল। তিনি চোখ বন্ধ করলেন।

অজ্ঞান হবার আগে শেষ যে কথাটি শুনেছিলেন তা হল, "হালায় অজ্ঞান হইয়া গেছে। অই মুসাদ্দেক, মুসাদ্দেক..."

পরদিন লেখক আফসার উদ্দিনকে নদীর অন্য পাড়ে একটা গাছের নিচে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া যায়। তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়। পরিবারের লোকজনকে খবর দেয়া হয়। আফসার উদ্দিনের মানসিক অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ায় তাকে একটি মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আগেও দুবার তাকে এরকম অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে থাকতে হয়েছে।

এই মানসিক হাসপাতালে ভর্তির তিন দিনের মাথায় লেখক আফসার উদ্দিন রুমের জানালার গ্রীলের সাথে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন। তার মৃত্যুর খবর দেশের সব বড় ছোট পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

প্রকাশিত হয় তার সেই ভয়ংকর মানসিক অসুস্থতার খবর। পত্রিকাগুলোর দুয়েকটি একে উল্লেখ করেছে নার্ভাস ব্রেকডাউন নামে। পৃথিবীর কোন কোন বিখ্যাত ব্যক্তির নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছিল, মানসিক অসুস্থতা ছিল তার লিস্ট দিয়েছে একটি পত্রিকা। ১৮৩৬ সালে আব্রাহাম লিংকনের নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছিল। তার প্রবল আত্মহত্যা প্রবণতা ছিল। গেম থিওরীখ্যাত বিজ্ঞানী জন ন্যাশের ছিল স্কিজোফ্রেনিয়া। ডাচ শিল্পী ভ্যানগগ যিনি তার

জীবদ্দশায় মাত্র একটি ছবি বিক্রি করতে পেরেছিলেন, তারও মানসিক অসুস্থতা ছিল। ৩৭ বছর বয়সে তিনি আত্মহত্যা করেন। ফ্রান্সের রাজা ষষ্ট চার্লসের এত মানসিক অসুস্থতা ছিল যে তিনি মনে করতেন তার শরীর কাচের। নোবেল বিজয়ী আর্নেস্ট হেমিংওয়ে ভুগতেন তীব্র হতাশায় এবং তিনিও আত্মহত্যা করেছিলেন। এই লিস্টে আরো আছেন বেটোভেন, আইজাক নিউটন, উইনিস্টন চার্চিল প্রমুখ।

পত্রিকাগুলোতে আরো প্রকাশিত হয়েছে, লেখক আফসার উদ্দিনের কাছে মায়া সভ্যতার প্রাচীন এক বই ছিল। সে বই নিয়ে তিনি উপন্যাস লেখা শুরু করেছিলেন। কিন্তু সেই প্রাচীন পুস্তক কিংবা তার লেখা কিছুই পাওয়া যায়নি।

লেখকের বাবা মা এবং স্ত্রী সবাই তার মানসিক অসুস্থতার ব্যাপারে জানতেন। আরো দুয়েকবার তিনি অসুস্থ হয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন। কিন্তু তারা জানিয়েছেন লেখক খুব একরোখা ছিলেন। তবে কখনোই তার আত্মহত্যা প্রবণতা ছিল না।

মৃত আফসার উদ্দিনের পাশে পাওয়া গেছে নীল কালিতে তারই হাতের লেখা শঙ্খ ঘোষের কবিতার লাইন,

"নিভন্ত এই চুল্লিতে মা
একটু আগুন দে,
আরেকটুকাল বেঁচেই থাকি
বাঁচার আনন্দে!"

পঞ্চম অধ্যায়

পুলিশের বিভাগীয় প্রধান সাইদুর রহমানের কাছে গোয়েন্দা বিভাগ থেকে তথ্য এসেছে নগরের উপকণ্ঠে একটি বাড়িতে প্রচুর সংখ্যক ইয়াবা রয়েছে এবং সেখান থেকেই সারা শহরে ইয়াবা সরবরাহ হচ্ছে। সাইদুর রহমান একসময় ছিলেন দুর্দান্ত অফিসার। যখন চাকরিতে যোগ দেন তখন সাহস এবং শারিরিক শক্তিতে সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। আইএসএসএফ ওয়ার্ল্ড শ্যুটিং ৩০০ মিটার রাইফেল চ্যাম্পিয়নশীপে তিনি দেশের একমাত্র স্বর্ণটি জিতেছিলেন। বর্তমানে সে উদ্যমী লোকটি অনেকটাই ভেঙ্গে পড়েছেন। তার বয়স পয়তাল্লিশের দিকে। একসময় অস্বাভাবিকভাবে কর্মজীবনে অনেক সাফল্য ধরে এনেছিলেন, সেই সাথে হয়তো তিনি তার পারিবারিক জীবনের দিকে অতটা লক্ষ্য দিতে পারেননি। পারিবারিক জীবনে কিছু অনাকাঙ্খিত আঘাতে শক্তিশালী এই মানুষটি অনেকটাই নিজের ভেতর গুটিয়ে গেছেন। সবকিছুতেই এখন তার নিরাসক্তি, শুধুমাত্র বড় একটি অপরাধী সংগঠনের প্রতি তার এখনো আগ্রহ রয়ে গেছে। যার অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি বিশ্বাস করেন।

সাইদুর রহমানের অবস্থার কথা ডিপার্টমেন্টের সবাই জানে। তিনি এলকোহলিক। কিন্তু তবুও তার কাজের ব্যাপারে কেউ সন্দেহ করতে পারে না। তাকে লোকে ভয় পায়, সমীহ করে। নিরাসক্ত বাঘ দেখলেও লোকে ভয় পাবে, এটাই স্বাভাবিক।

সাধারণত ছোট খাট অপরাধের খবর তার কাছে নিয়ে আসা হয় না। তিনি বলে রেখেছেন, শহরের ভেতরে শুধুমাত্র বড় মাদক চালানের খবর যেন তাকে দেয়া হয়। কারণ মাদকের সাথে তার পুরনো শত্রুদের সংশ্লিষ্টতা আছে।

সাইদুর রহমান ইয়াবার খবরে তাই উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। তার মনে হচ্ছে তিনি সেই সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসীদের ধরতে পারবেন আজ।

সাইদুর রহমান তার বিশেষ পুলিশ বাহিনীর কয়েকজন সদস্যকে বললেন, "ইয়াবা খেয়েছ কোনদিন?"

পুলিশ অফিসাররা জানাল, "না স্যার।"

সাইদুর রহমান পিস্তল রেডি করতে করতে বললেন, "না খেলে বুঝবে কীভাবে? আমি খেয়েছিলাম। মেথএম্ফিটামিন ও ক্যাফেইনের মিশ্রণ। ঘ্রাণ অনেকটা বিস্কুটের মত। এখানে যেগুলো আছে গোলাপজল না চিতা?"

অফিসারদের ইতস্তত মুখ দেখে সাইদুর রহমান বুঝতে পারলেন এরা জানে না। তিনি তখন তার মুখের খোঁচা

খোঁচা দাড়ি চুলকে বললেন, " চিতা হচ্ছে সবচেয়ে বাজে বাবা। আরেকটি আছে দামে স্বস্তা, নিম্নমানের। ডাকা হয় ভেজাল নামে। সবচেয়ে ভালোটা হচ্ছে গোলাপ জল। ট্যাবলেটের গায়ে ডব্লিউ ওয়াই লেখা থাকে। ওয়াই দীর্ঘ হলে এবং ট্যাবলেটের রঙ গোলাপি হলে, এটি ভালো মানের।"

অফিসাররা ধন্যবাদ জানাল। সাইদুর রহমান ভ্রুক্ষেপ না করে জিজ্ঞেস করলেন, "সবাই রেডি তো?"

একজন অফিসার জানাল, "জ্বী স্যার। রেডি।"

সাইদুর রহমান বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলেন তিন গাড়ি ভর্তি পুলিশের বিশেষ বাহিনীর সদস্য। আধুনিক অস্ত্র যেমন সাব মেশিনগান, স্নাইপার রাইফেল, সেমি অটোমেটিক শটগান, এসাল্ট রাইফেল নিয়ে তৈরী সুসজ্জিত বাহিনী। সাইদুর রহমান গাড়িতে উঠতেই গাড়ি চলা শুরু করল। তিনি তার পিছনে বসা এই মিশনের দ্বিতীয় প্রধান অফিসারকে বললেন, "কেউ যেন না মরে। পায়ে গুলি করবে। ওদের আমার খুব দরকার।"

অফিসারটি "জ্বী স্যার" বলে এই নির্দেশ ছড়িয়ে দিল হাতের যোগাযোগ যন্ত্রের সাহায্যে।

প্রায় মিনিট বিশেকের মধ্যে তারা সেই বাড়িটার সামনে পৌছলেন। বাড়িটি বেশ পুরনো, পলেস্তারা খসে পড়ছে। মনে হচ্ছে বহুদিন কোন সংস্কারের কাজ হয়নি। সাইদুর রহমান দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির চারপাশে অবস্থান

নিতে বললেন সবাইকে। তার ধারণা ছিল তাদের উপর বাড়ির ভেতর থেকে প্রতিরোধ আসবে। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পরও দেখা গেল ভেতরে মানুষের কোন সাড়াশব্দ নেই। তখন সাইদুর রহমান শুধুমাত্র একটি পিস্তল হাতে চললেন বাড়ির মূল দরজার দিকে। বাহিনীর অন্য সদস্যরা যারা এই প্রথম সাইদুর রহমানের সাথে কোন মিশনে এল তারা অবাক হয়ে গেল। যদিও পুরনোরা জানত এটাই স্বাভাবিক। ভয় বস্তুটা সাইদুর রহমানের কাছে আগেও কম ছিল, এখন একেবারেই নেই। হয়তো সন্ত্রাসীরা ঘাপটি মেরে আছে বাড়ির ভেতরে এটা বুঝার মত বোধশক্তি তার ছিল কিন্তু তার সামান্যতম ভয় লাগল না। তিনি মনে করেন তার হারানোর মতো কিছুই নেই।

সাইদুর রহমান দরজার সামনে গিয়ে লাথি মেরে দরজা ভেঙ্গে ফেললেন এবং প্রায় ঝাঁপিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন। বাইরের অন্য সদস্যদের ভেতরে তখন উৎকণ্ঠা। ঘরের ভেতরে বেশ কয়েকটি গুলির শব্দ হল। পুলিশের বিশেষ বাহিনীর সদস্যরা উৎকণ্ঠা এবং ভয়ে মাখামাখি হয়ে কিছুটা সামনে এগুলো।

ঠিক তখনি সাইদুর রহমানের ঝাঁঝালো চিৎকার এল ভেতর থেকে, "সবাই ভেতরে আসো।"

দৌড়ে সবাই এগিয়ে গেল। ভেতরে গিয়ে দেখা গেল সাইদুর রহমান একটা খাট উল্টে ফেলেছেন। সেই খাটের নিচে সাজানো সারি সারি গোলাপি ট্যাবলেট।

সাইদুর রহমান বিরক্তিভরা কণ্ঠে বললেন, "কেউ এদের আমরা আসার আগেই এদের ইনফর্ম করেছে। সবকটা পালিয়েছে।"

তিনি একটা সিগারেট ধরিয়ে বাইরে বেরোলেন। মারাত্মক বিরক্ত হয়েছেন তিনি। হাঁটতে শুরু করলেন সিগারেট টানতে টানতে। তাকে কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পেল না কেউ।

সাইদুর রহমান গাড়ি না নিয়েই হেঁটে এগুলেন রাস্তা দিয়ে। শহরের উপকণ্ঠে এই জায়গাটা বেশ অনুন্নত। রাস্তার স্থানে স্থানে ভাঙ্গা। নিরাসক্তভাবে তিনি একটু এগিয়ে যাওয়ার পর দেখতে পেলেন কালো আলখেল্লা পড়া একটি লোক তার দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি লোকটিকে চিনতে পারলেন। লোকটি উজান ফকির।

লোকটি এগিয়ে এসে বলল, "স্যার, আপনে এইখানে কি করেন?"

সাইদুর রহমান বললেন, "সিগারেট খাই। আপনি কি করেন?"

"আমার কামই তো এই। ঘুরে বেড়ানো। স্যার কি ওই পুরান ভাঙ্গা বাড়িতে হানা দিলেন? পাইলেন কিছু, এনিথিং?"

সাইদুর রহমান বিরক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন "আপনি কীভাবে জানলেন?"

"গায়েবী পদ্ধতিতে স্যার। তয় এখন যাই আমি, কাজ আছে।"

লোকটি হন হন করে হেঁটে গেল। সাইদুর রহমান নিরাসক্তভাবে আবার সেই ইয়াবা পাওয়া যাওয়া বাড়িতে ফিরে গেলেন। সব ট্যাবলেটগুলো গাড়িতে তোলা হচ্ছে। তিনি একটা গাড়িটে উঠে ফিরতে শুরু করলেন অফিসের দিকে।

ফিরতে ফিরতে ভাবছিলেন উজান ফকির লোকটার কথা। অদ্ভুত লোক।

এই লোকটার সাথে তার পরিচয়ও বেশ অদ্ভুতভাবে। বেশ ক'বছর আগে সাইদুর রহমান হঠাৎ একদিন এই লোকটির ব্যাপারে রিপোর্ট পান। সে শহরের ব্যস্ত রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে ঝামেলার সৃষ্টি করছিল। তাকে থানায় ধরে আনা হল।

সাইদুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন, "গাড়ি থামিয়ে যানজট সৃষ্টি করে লোকজনকে কষ্ট দেন কেন?"

লোকটি নির্বিকারভাবে বলল, "আমি কাউরে কষ্ট দেই না। কথা কই। পরিচিতদের লগে আলাপ করবার অধিকার আমার আছে নিশ্চয়ই।"

"পরিচিত মানে? গাড়ির লোকেরা আপনার পরিচিত ছিলো?"

"জ্বী না। তেনারা ছিলেন না। মানুষের লগে আমার কাজ কারবার কম। ভেরী লিটল।"

"মানে?"

"মানে হইল গিয়া আমি গাড়ির লগে কথা কই। লাল গাড়ি। যার লগে কথা কইছিলাম তার নাম হইল গিয়া চৌধুরী টু টু ফাইভ সেভেন।"

এরকমক কথাবার্তায় সাইদুর রহমানের সাথে প্রথম উজান ফকিরের পরিচয়। উজান ফকির গাড়ির সাথে কথা বলে। তাও সব গাড়ি না, লাল গাড়ি। রাস্তায় লাল গাড়ি দেখলেই সে ছুটে আসে। অতি পরিচিতজনের মত হেসে হেসে গাড়ির সাথে আলাপ জুড়ে দেয়। সে কারো কোন ক্ষতি করে না। কিন্তু গাড়ির সাথে তার এই দীর্ঘ আলাপের ফলে সৃষ্টি হয় যানজট এবং নানাবিধ সমস্যার। সে বেশ কয়েকবার এই কাজের জন্য জেল খেটেছে। কিন্তু তবুও তার এই অভ্যাস যায় না। তাকে জিজ্ঞেস করা হলে সে নির্বিকার ভঙ্গিতে বলে, "সামাজিকতা রক্ষার খাতিরে কথা বলা আমার অধিকার স্যার। ফান্ডামেন্টাল রাইট।"

শহরে তার প্রচুর ভক্ত আছে। এরা বিভিন্ন সমস্যায় তার কাছে যায় এবং সে নিঃস্বার্থভাবে তাদের সেসব সমস্যার সমাধান করে দেয় "ফুঃ" কিংবা "দোয়ার" মাধ্যমে। তার "ফুঃ" এবং "দোয়াতে" কাজ হয় এবং তার জীবনযাপন একেবারেই অনাড়ম্বর বলে তার ভক্তসংখ্যা অনেক।

সাইদুর রহমান ব্যস্ত এবং কাজের ব্যাপারে নিরাসক্ত মানুষ হলেও তিনি উজান ফকিরের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে পড়েন। তিনি লোকটাকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। বিভিন্ন

রঙের গাড়িতে লাল রঙ করে উজান ফকিরের সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। সাইদুর রহমানের উদ্দেশ্য ছিল, দেখা সে এই গাড়িগুলোর সাথে কথা বলে কি না!

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পুরোপুরি লাল রঙ করা থাকা সত্ত্বেও উজান ফকির সেসব গাড়ির সাথে কথা বলেনি। অরিজিনাল লাল রঙের গাড়ি সে যেন অদ্ভুত উপায়ে চিনতে পারে!

শহরে লাল গাড়ির সংখ্যা বেশি ছিলো না। আর সাইদুর রহমান বলে দিয়েছিলেন, লোকটির সাথে যেন কোন অন্যায় না করা হয়। গাড়ির সাথে কথা বলে ঝামেলার সৃষ্টি করলে তাকে সাময়িক সরিয়ে নিলেই হবে। সে যেহেতু কারো কোন ক্ষতি করছে না সেভাবে সুতরাং তাকে জেলে ভরে রাখার কোন কারণ হয় না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আফসার উদ্দিনের মৃত্যুর তিনদিন পর পত্রিকায় পুরাতন মায়াদের বইয়ের ব্যাপারটা পড়েই পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সাইদুর রহমানের খটকা লাগল। তার মনে এক আশংকা খেলে গেল খুব দ্রুত। কিন্তু এ কী সম্ভব? এরা কি এই লেখককে খুন করতে পারে? সাইদুর রহমান খানিকক্ষণ কিছু হিসেব মেলানোর চেষ্টা করলেন। পত্রিকায় আগাগোড়া রিপোর্টটা পড়লেন। তার মনে হল যেন কোথাও কিছু তথ্য মিসিং।

সেগুলো জানতে হলে লেখক আফসার উদ্দিন সম্পর্কে আরো খোঁজখবর নিতে হবে।

সাইদুর রহমান কয়েকজন গোয়েন্দা সদস্যকে লাগিয়ে দিলেন আফসার উদ্দিন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য। আত্মহত্যা হয়েছে তিনদিন আগে। সুতরাং, ঘটনার স্থান দেখে কিছু বুঝা যাবে না। এই আত্মহত্যার বিষয়ে যে পুলিশ অফিসার কাজ করেছিলেন তার সাথে কথা বলেও কিছু জানা গেল না। এমনকী সেই কাগজ যেখানে নীল কালিতে আফসার উদ্দিন শঙ্খ ঘোষের কবিতা লিখে রেখেছিলেন সে কাগজটা পর্যন্ত পাওয়া গেল না!

সাইদুর রহমান একবার গিয়ে আফসার উদ্দিনের স্ত্রীর সাথে কথা বলে আসলেন। লোকটার মৃত্যু যদিও স্বাভাবিক মনে হচ্ছে তবুও এর মধ্যে কিছু অস্বাভাবিকতা আছে। কারণ তার সাথে সেই পুরাতন বই পাওয়া যায়নি। মানসিক হাসপাতালের ডাক্তাররা বলেছেন যখন লেখক ভর্তি হন তখনো তার সাথে বই ছিল না। কিন্তু তার স্ত্রী বলছেন সত্যি-ই একটি প্রাচীন বই তার সাথে ছিল যখন তিনি সেই ভাঙ্গা বাড়িতে যান।

সাইদুর রহমানের লোকগুলো বেশ করিৎকর্মা। তারা কয়েকঘন্টার মধ্যে একটা ফাইল এনে দিল। লেখক আফসার উদ্দিনের জীবন বৃত্তান্ত। লোকটি মানসিক রোগে ভুগতো। তার স্কিজোফ্রেনিয়া ছিল। কিন্তু হাসপাতালে ভর্তি হবার মত অবস্থা ছিল না। যদিও অতীতে কয়েকবার সে মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে। তার লেখার হাতও ভাল ছিল।

সাইদুর রহমান জীবন বৃত্তান্ত পড়েও কোন ক্লু পেলেন না। এখন আরেকটা কাজ বাকি আছে। সেটা হল লোকটা যে ভাঙ্গা বাড়িটায় লেখতে গিয়েছিল সেখানটা দেখে আসা। শহরের এক প্রান্তে নদীর ধারের ঐ অংশটা সাইদুর রহমান ভাল করে চেনেন। বস্তুত পুরো শহরের অলিগলি তার চেনা। দিনে ও রাতে তাকে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ছুটে বেড়াতে হয়েছে এ শহরে। একসময় তীব্র তেজ এবং আক্রোশের সাথে ক্রাইম নির্মূলে নেমেছিলেন। এবং

সেসময়েই অদ্ভুত এক সত্যের মুখোমুখি হন তিনি। সেই শক্তির বিরুদ্ধে লড়েছেন নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছেন। একসময় না পেরে অথবা অন্য কোন কারণে কৌশলগত সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। কখনও সাহায্য নিয়েছেন। কখনও করেছেন আদর্শিক বিতর্ক।

এখনো সেই রকমই আছে। তবে সাইদুর রহমান তার নীতি এবং আদর্শে অটল। এই শহরের নিরাপত্তা এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে অনড়।

সাইদুর রহমান শহরের প্রান্তে নদীর ধারে লেখক আফসার উদ্দিন যে বাড়িতে ছিলেন সে বাড়িতে এলেন। একেবারে ভাঙ্গা একটি খুঁপরি বাড়ি। লোকটা আসলেই অদ্ভুত ছিল। তা না হলে এমন অদ্ভুত জায়গায় কেউ বই লিখতে আসে!

তবুও সাইদুর রহমান লোকটিকে মানসিক অসুস্থ মনে করতে পারছেন না। তিনি অন্য কিছুর সন্দেহ করছেন।

পুরো বাড়ি তিনি ঘুরলেন। কোথাও সন্দেহ করার মত কিছু নেই। বাড়ির সামনের ডাস্টবিনটা দেখে কি মনে করে তিনি তাতে গিয়ে দেখতে পেলেন কিছু কাগজের স্তুপ। সাইদুর রহমানের চোখ চকচক করে উঠল। একটা কাঠের টুকরা নিয়ে কাগজের স্তুপে খোঁচা দিতেই তিনি দেখতে পেলেন পত্রিকার পাতা। প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন তাতে।

বের হল বেশ কয়েকদিন আগের এক পত্রিকা। সেখানে একটি পাতায় লেখা নিম্নোক্ত রিপোর্টঃ

"প্রকাশকের মেয়ে খুনঃ লেখক আফসার উদ্দিন নিরুদ্দেশ"।

ডেস্ক রিপোর্টঃ ওয়ান বাই ওয়ান প্রকাশনীর মালিক তরিক আলী হাওলাদারের তরুনী মেয়েকে খুন করে এবং বই দেবার নাম করে আগাম কয়েকলাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে দেশের বিখ্যাত লেখক আফসার উদ্দিন এখন পলাতক আছেন। উল্লেখ্য বরেন্য লেখক আফসার উদ্দিন দেশ বিদেশের অনেক পুরষ্কারপ্রাপ্ত একজন সাহিত্যিক। এই ঘটনায় হতাশ এবং ক্ষুব্ধ তার ভক্তরা। লেখকের স্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন- উনার সাথে তিনমাস ধরে আমার কোন সম্পর্ক নেই। পুলিশ জানিয়েছে খুনের মোটিভ ঠিক বুঝা যাচ্ছে না। লেখকের কিছু মানসিক অসুস্থতা ছিল। পুলিশ তাকে ধরার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আফসার উদ্দিনের মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তা বন্ধ পাওয়া যায়।

সাইদুর রহমান নিউজটি পড়লেন। স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে এ নিউজ বানিয়েছে যারা তাদের প্ল্যান খুব নিঁখুত ও অদ্ভুত। তারা এরকম রিপোর্ট করেছে যাতে আফসার উদ্দিনকে ভয় দেখানো যায়। কিন্তু কেন এরকম ভয় দেখানো?

তিনি দ্রুত ঐ পত্রিকার অফিসে গিয়ে ডাস্টবিনে পাওয়া পত্রিকার তারিখের একটি পত্রিকা সংগ্রহ করলেন। সব ঠিক আছে, শুধু প্রথম পাতাই বদলে দেয়া হয়েছে। এরকম ধূর্ত কাজ যারা করতে পারে সাইদুর রহমান তাদের একটি

দলকে বেশ ভালো করেই চিনেন। তবে তারা এই ঘটনার সাথে যুক্ত কি না এখনো বুঝা যাচ্ছে না।

এদের সাথে তার বহুদিনের পরিচয়। একই শহরে তিনি বাস করেন আইনের প্রভূত ক্ষমতা নিয়ে আর তারা বাস করে নিজেদের এক অপার্থিব ক্ষমতাকে সাথে নিয়ে। এদের শক্তির সাথে যুদ্ধ করতে হলে বাহিনীর সমস্ত শক্তি নিয়ে নামতে হবে, সাইদুর রহমান তা জানেন। এজন্য প্রয়োজন ডিপার্টমেন্টের একেবারে উপরের স্তর থেকে নির্দেশ এবং সাহায্য। কিন্তু ডিপার্টমেন্টের একেবারে উচুতে বসে থাকা কর্তাব্যক্তিরা সাইদুর রহমানের কথায় কান দিচ্ছেন না। এরকম কোন সংগঠনের অস্তিত্ব তাদের কাছে হাস্যকর ব্যাপার। আর সবচেয়ে বড় কথা সাইদুর রহমান যতই এদের অস্তিত্বের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে থাকুন না কেন, তিনি নির্দিষ্ট কোন প্রমাণ দেখাতে পারেননি। এদেশে আদর্শভিত্তিক আন্ডারগ্রাউন্ড গোষ্ঠি যে কখনও ছিল না এমন না। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে নিজেদের আদর্শে দেশ পরিচালিত করার অভিলাষে আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনীতি হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার। কিন্তু সেসব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। প্রতিবিপ্লব, আভ্যন্তরিন বিরোধ, আদর্শগত দ্বন্দ্ব এবং সর্বোপরি সরকারের সর্বাত্মক চেষ্টার ফলে সেসব গোষ্ঠি প্রায় ধ্বংস হয়েছে। রাজনৈতিক আদর্শভিত্তিক আন্ডারগ্রাউন্ড দলগুলোর ব্যাপারে সবখানেই সরকার সতর্ক থাকে। কিন্তু

আদর্শভিত্তিক সংঘবদ্ধ অপরাধ সংগঠনের যদি কোন রাজনৈতিক অভিলাষ না থাকে তবেই দেখা যায় সরকারের উদার উদাসীনতা।

কিন্তু এবার এই লেখকের হত্যার সাথে যদি এদের সম্পর্ক পাওয়া যায় তাহলে তিনি বসে থাকবেন না। যেকোনভাবেই হোক এদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করবেন। সাইদুর রহমান অনেকদিন ধরে এরকম একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন।

সুযোগ তাহলে পাওয়া গেল! কিন্তু প্রমাণ করা সহজ না। হবে খুব কঠিন। সাইদুর রহমান ঠিক করলেন রাতেই দেখা করার চেষ্টা করবেন ফিলসফারদের সাথে। কিন্তু এর আগে তিনি গেলেন লেখকের স্ত্রীর সাথে দেখা করতে। লেখকের স্ত্রী তার বাবার বাড়িতে ছিলেন। মেয়েটির সাথে কথা বলে জানা গেল লেখকের মানসিক অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ায় সে প্রায় তিন মাস আগেই আফসার উদ্দিনের বাড়ি ছেড়ে এ বাড়িতে এসে উঠেছে।

সাইদুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন, "তার মানসিক সমস্যা কি ধরণের ছিল?"

লেখকের স্ত্রী বললেন, "তিনি অস্বাভাবিক কিছু আচরণ করতেন। যেমন, ঘুমের মধ্যে হাঁটা, ঘুমের মধ্যে গলা চেপে ধরা, বিভিন্ন জায়গা থেকে মরা জীবজন্তু পশুপাখি এনে বিছানায় বালিশের নিচে লুকিয়ে রাখা এসব। এছাড়া তিনি একা একা কথা বলতেন।"

"আর কিছু কি ছিল?"

"আর কিছু বলতে তিনি মনে করতেন তার এসব সমস্যার জন্য দায়ী তার কাছে থাকা প্রাচীন একটি বই। এই বইয়ের গল্পটি তিনি নিজের ভাষায় লিখে ফেলতে পারলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ফলে এ বিষয়ে তার জেদ চেপে গিয়েছিল।"

মেয়েটির বাবা অর্থাৎ লেখকের শ্বশুর পাশেই বসা ছিলেন। তিনি বললেন, "এসব সমস্যার জন্য তাকে ডাক্তারও দেখানো হয়। পরে ডাক্তার সব শুনে বললেন তিনি যখন মনে করছেন বই লিখে ফেললেই তিনি শান্তি পাবেন তাহলে লিখেই ফেলুন। ভালো হয় একাকী কোন জায়গায় গিয়ে লিখে ফেললে।"

"আপনি বইটা দেখেছেন?" প্রশ্ন করলেন সাইদুর রহমান।

লেখকের স্ত্রী বললেন, "হ্যা, দেখেছি। অনেক পুরনো বই, তামাটে রঙের। উপরে উল্কীর মত হায়ারোগ্লিফিক ভাষায় কিছু লেখা ছিল।"

"এই বইটার ব্যাপারে আর কেউ কি জানতেন? উনার বা আপনাদের কোন বন্ধুবান্ধব?"

লেখকের স্ত্রী একটু ইতস্তত করে বললেন, "না, তেমন কেউ জানতেন না। ওয়ান বাই ওয়ান প্রকাশনের মালিক তরিক আলী সাহেব জানতেন।"

"উনার কি বাড়িতে আসা যাওয়া ছিল?"

লেখকের স্ত্রী বললেন, "ছিল। উনি বন্ধুর মত ছিলেন।"

"কার বন্ধুর মত? আফসার উদ্দিন সাহেবের?"

"জ্বী।"

"বইটার ব্যাপারে তার কি কোন আগ্রহ ছিল?"

লেখকের স্ত্রী ইতস্তত করে বললেন, "আমি সঠিক বলতে পারব না।"

"আচ্ছা, আফসার উদ্দিন কি এর আগে এরকম কোন নির্জন জায়গায় গিয়ে বই লিখেছেন? আপনাদের জানা আছে?"

সাইদুর রহমান প্রশ্নটি করে দুজনের দিকে তাকালেন।

লেখকের স্ত্রী বললেন, "উনার একটি বই লিখতে তিনি প্রায় একবছর একটা প্রাচীন বাড়িতে নিয়মিত যেতেন। শেষপর্যায়ে একসময় অসুস্থও হয়ে পড়েছিলেন এরকম গল্প করেছিলেন আমার সাথে। তিনি খুব কম কথা বলতেন। তার বেশ ক'টি বই লেখার জন্য তিনি বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে থেকেছেন।"

"আচ্ছা, উনি অসুস্থ হবার পর কোন ডাক্তার দেখিয়েছিলেন আপনারা? তার সাথে আমি কথা বলতে চাই উনার রোগটার ব্যাপারে।"

লেখকের স্ত্রী বললেন, "ডাঃ গোপাল চন্দ্র দেব দেখেছিলেন।"

আরো বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর সাইদুর রহমান চলে গেলেন ওয়ান বাই ওয়ান প্রকাশনীর মালিক তরিক আলী সাহেবের কাছে। এই ভদ্রলোকের বেশ প্রভাব আছে বইপাড়ায়। প্রকাশনা বাণিজ্যের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি। এছাড়া আন্তর্জাতিক বই ব্যবসায়ও তার বেশ ভালো উপস্থিতি আছে। বছরের বেশিরভাগ সময় ব্যবসার খাতিরে বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ান। প্রাচীন এবং পুরনো জিনিসপত্র সংগ্রহের শখ তার আছে। সেলিব্রেটি প্রকাশক বলে তার এই বিভিন্ন এন্টিক জিনিসের কালেকশন নিয়ে পত্র পত্রিকায় বেশ লেখালেখি হয়। কিন্তু ভদ্রলোক বেশ আমুদে। পান খান এবং হাসিমুখে কথা বলেন।

সাইদুর রহমানকে তিনি বললেন, "লোকটা বই ভাল লেখলেও অদ্ভুত আছিলেন। এত বড় জনপ্রিয় লেখক হইয়াও কখনও লিটারারী সার্কেলের ত্রি সীমানায় যান নাই, কোনদিন কোন গ্রুপিং করেন নাই। তার কোন লেখক বন্ধুও আছিল না। এতদিন ধরে আছি প্রকাশনা শিল্পের লগে কিন্তু এরকম লেখক আমি আর একটাও দেখি নাই।"

সাইদুর রহমান বললেন, "শুনেছি আপনি উনার বন্ধু ছিলেন?"

তরিক আলি হাসিমুখে বললেন, "বন্ধু বলা যায়। গত আট বছর ধইরা উনার বই আমি প্রকাশ কইরা আসছি। উনার ভিতর যে সততা আছিল তা আমারে সবসময়ই টানছে। এছাড়া সবাই এই কথা মানতে বাধ্য, তিনি লেখক

হিসেবে আছিলেন বড়মাপের। উনার অসুস্থতার লগে আমি কিছুটা পরিচিত আছিলাম। তবে অসুস্থতা এইবার যেন হঠাৎ কইরা একটু বেশি বাইড়া যায়। এমন সব কান্ড করতে থাকেন যা আগে কখনও করেন নাই। তাই আমিই তারে ডাক্তার দেখাই। ডাক্তার দেখানো তিনি পছন্দ করতেন না। রাইগা যাইতেন।"

"আপনিই ডাক্তার নিয়ে গিয়েছিলেন?"

"হ্যা। আমিই। মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার গোপাল বাবুকে নিয়া গেছিলাম।"

"আপনি কি উনার প্রাচীন মায়াদের বইটি নিয়ে জানতেন?"

"জানব না কেন? অবশ্যই জানতাম। খুব দারুণ জিনিস আছিল।"

"আপনার তো পুরনো জিনিসপত্র সংগ্রহের শখ আছে শুনেছি?"

"সেটা তো আছে। বিভিন্ন দেশে যাইতে হয় বিভিন্ন কামে কাজে। তখন ঘুরতে ফিরতে যা পুরান জিনিস পাই কিইন্যা নিয়া আসি। তেমন দামী কিছু না হইলেও জিনিস আছে অনেক।"

সাইদুর রহমান প্রকাশকের সাথে কথা বলার পর দেখা করতে গেলেন ডাক্তারের সাথে। গোপাল চন্দ্র দেব খুব বিখ্যাত মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ। ভদ্রলোক লেখক আফসার উদ্দিনের সমস্যাটার ব্যাপারে বললেন, "এটি

একটি "রেয়ার" কেস। স্কিজোফ্রেনিয়ার একটি পর্যায়ে রোগী অনেক কিছু দেখে বা শুনতে পায়। যাকে বলে হ্যালোসিনেশন। চরম অসুস্থতায় এধরনের রোগীকে কয়েকদিন হাসপাতালে থাকতে হতে পারে। আফসার উদ্দিন স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত ছিলেন। এর আগেও তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিয়ে গেছেন। তবে এখনকার ব্যাপারটিতে মনে হয়েছিল বইটা লিখতে পারলেই তিনি মানসিক শান্তি পাবেন। তবে মরা জীবজন্তু বিছানায় নিয়ে আসা ইত্যাদিকে আমি স্কিজোফ্রেনিয়ার অন্তর্ভূক্ত হিসেবে ভাবছি না। হয়তো তার অন্যধরনেরও মানসিক অসুস্থতা ছিল যা ধরতে পারা যায়নি।"

আরো কিছু কাজ সেরে সাইদুর রহমান সন্ধ্যায় ফিরলেন বাসায়। কাজের লোক তার হাতে একটা চিরকুট দিয়ে বলল একজন ভিক্ষুক দিয়ে গেছে। সাইদুর রহমান কাগজটা খুলে দেখলেন সেখানে লেখা আছে-

Audi partem alterum. (Hear the other side.)
- Saint Augustine

লেখাটি দেখেই সাইদুর রহমানের মনে পড়ল সেই লোকদের কথা। সাইদুর রহমান মনে করেন শহরের আন্ডারওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বড় এবং শক্তিশালী সংগঠন এই ফিলোসফারস। তাদের শক্তি, ক্ষমতা এবং যুক্তি এতই

বিস্তৃত যে প্রায় সব কিছুই যেন তারা নিয়ন্ত্রণ করে অসাধারন ক্ষমতায়। মূলত এদের সাথেই পাল্লা দিতে দিতে সাইদুর রহমানও পুলিশ ডিপার্টমেন্টে এক বিশেষ বাহিনী গড়ে তুলেছেন। কিন্তু তবুও পাত্তা পাওয়া যায় না। এক অদ্ভুত ক্ষমতাবলে তারা টিকে আছে।

অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে সাইদুর রহমান এদের সাথে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন সময় আলোচনায় মিলিত হয়েছেন।

সেদিন রাতেও তাকে নিয়ে যাওয়া হল এক গোপন কক্ষে। কক্ষের চারপাশ জুড়ে বিভিন্ন প্রাচীন দার্শনিকদের পাথরের মূর্তি সাজানো। সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল, থেলিস, পিথাগোরাস, জেনোফ্যানিস, ডায়োজিনিস, দেকার্তে সবাই আছেন পাথরের মূর্তি হয়ে। আবার কক্ষে জীবন্ত হয়েও আছেন। এই সংগঠনের সদস্যরা নিজেরা একেকজন প্রাচীন দার্শনিকদের নাম ধারণ করে আছে। সেই প্রাচীন পোষাক আশাক। বিস্ময়ের ব্যাপার হল এদের কি আসল নাম, কি পরিচয় সে সম্পর্কে কোন তথ্য নেই সাইদুর রহমানের কাছে। মাঝে মাঝে সাইদুর রহমান ভাবতে ভালোবাসেন এরা বোধহয় সেই প্রাচীন ফিলোসফাররাই, আবার নেমে এসেছেন।

এদের সম্পর্কে সম্ভবত দেশের খুব অল্প ক'জন লোকই জানেন কিন্তু প্রায় সব ক্ষমতাবানরাই নিয়ন্ত্রিত হন এদের দ্বারা বলে সাইদুর রহমানের ধারনা।

এদের প্রধান যে ব্যক্তি তার নাম সক্রেটিস। সক্রেটিসকে যেমন দেখা যায় একরকম প্রাচীন গ্রীসের পোষাক পরিহিত সেও এইরকম পোষাক পরে।

সাইদুর রহমানের সামনে হাসি হাসি মুখ করে লোকটি বসে আছে। সাইদুর রহমান গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "কাজটি কি আপনারাই করেছেন?"

সক্রেটিস জিজ্ঞেস করল, "কোন কাজ?"

সাইদুর রহমান ঠান্ডা গলায় বললেন, "লেখক আফসার উদ্দিনের হত্যাকান্ডের কথা বলছি আমি। সে মায়াদের প্রাচীন বইটি কোথায়?"

সক্রেটিস নামের লোকটি আবার সেই হাসিমুখেই বলল, "আপনার কি মনে হয় আমরা লেখকদের মেরে বেড়াই? আপনি যদি আমাদের নিয়ে না ভেবে সত্যি সত্যি শহরের আইন শৃঙ্খলার ব্যাপারে ভাবতেন তাহলে অনেক উন্নতি হত।"

সাইদুর রহমান বললেন, "আমি নিশ্চিত এখানে আপনাদের হাত আছে। লোকটার কাছে প্রাচীন মায়াদের একটি বই ছিল। যা সম্ভবত কোন ইংরেজ এদেশে নিয়ে আসে।"

সক্রেটিস নামের লোকটি বলল, "ইংরেজ নিয়ে আসেন? বেশ ভালো। দেখা যাচ্ছে, ইংরেজ সাহেবরা তাহলে শুধু নিয়েই যাননি, কিছু দিয়ে গেছেনও!"

সাইদুর রহমান বললেন, " আপনারা এর সাথে যুক্ত কি না আমি সরাসরি জিজ্ঞেস করছি।"

সক্রেটিস নামের লোকটি বেশ গম্ভীর গলায় বলল, "দেখুন সাইদুর সাহেব, আপনি আমাদের চেনেন অনেকদিন ধরে। কিন্তু তবুও আপনি আমাদের বুঝতে পারেন না। আমাদের প্রতিটি কাজের পেছনে এক ধরনের দর্শন রয়েছে। পৃথিবীর বড় বড় দার্শনিকদের দর্শন। তা আপনাকে বলেছি অনেকবার। কিন্তু আমার মনে হয় আপনি বিশ্বাস করেন না। আমরা সক্রেটিক আয়রনি দ্বারা পরিচালিত। যে আয়রনি হল বুর্জোয়া সমাজের প্রতিটা রীতি নীতি নৈতিকতাকে প্রশ্ন করা। আপনাকে বুঝাতে পেরেছি?"

সাইদুর রহমান চুপ করে রইলেন। এ কথা তিনি অনেকবার শুনেছেন এদের কাছ থেকে।

সক্রেটিস নামের লোকটা বলল, "এই যে আপনি বা আপনারা, আপনাদের কোন ইন্ডিভিজ্যুয়ালিটি আছে? নাই। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রশ্ন করেন জীবনে ইউনিক কি করেছেন। যে শার্ট পড়েছেন, যে জুতা পড়েছেন ওগুলো একসাথে হাজার হাজার তৈরী হয়। এগুলো পড়ে, জীবনে ইউনিক কিছু না করে, সমাজ যা করতে বলেছে তা করে, সেই হাজার হাজার মেশিন মেইড প্রোডাক্টের মত এক কপি মাত্র হয়ে যাচ্ছে মানুষেরা। এই বুর্জোয়া সমাজের রোবট। হাজার হাজার যেসব প্রোডাক্ট একসাথে উৎপন্ন হয় মেশিনে সেগুলোর মত একটা প্রোডাক্ট। এই আধুনিকতার একটা প্রোডাক্ট মাত্র। কিন্তু আমরা তা নই।"

সাইদুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন, "ইন্ডিভিজ্যুয়ালিটি কি মানুষ হত্যা করে? আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে?"

সক্রেটিস নামের লোকটি বলল, "অবশ্যই না সাইদুর সাহেব। আমরা হত্যা করি না। আমরা খুব সাধারণ একটি সংগঠন। জ্ঞানচর্চাই আমাদের প্রধাণ লক্ষ্য। আর আইনের কথা বলছেন? দার্শনিক কেলিক্লিস এ সম্পর্কে অনেক আগেই বলেছেন। শক্তিমানদের নিয়ন্ত্রণের জন্য দূর্বলেরা আইন বানিয়েছে। *Auctoritas non veritas facit legem!Ó*

"এর মানে কী?"

"ইংলিশ দার্শনিক থমাস হবসের কথা। এর অর্থ *Authority, not truth, makes law.Ó*

সাইদুর রহমান আবার বুঝতে পারলেন এদের সাথে কথায় পারা সম্ভব না। তাই তিনি কথা শেষ করার জন্য জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে বলছেন আপনারা লেখককে হত্যা করেননি?"

লোকটি মাথা নেড়ে বলল, "অবশ্যই না স্যার।"

সাইদুর রহমান বললেন, "আমি কিন্তু হত্যাকারীকে খুঁজে বের করব। এবং সে যেই হোক না কেন। আপনারা হলেও বাঁচতে পারবেন না।"

সক্রেটিস নামের লোকটি বলল, "আপনি কি আমাদের প্লেটোর ক্লাসে একদিন আসবেন? আমাদের প্লেটো এখানে তার প্রতিষ্ঠান নিয়ে বসেছেন। সেই একই নাম "একাডেমী"। আমাদের এরিস্টটল খুলেছেন "লাইসিয়াম"। দুজায়গাতেই জ্ঞানতত্ত্বের চর্চা হয়।"

কথার মাঝখানে প্লেটোর আগমন হল। মানে এদের প্লেটো। প্রায় ছয়ফুট লম্বা একজন লোক। তারও পোষাক

প্রাচীন গ্রীকদের মত। সে এসে সাইদুর রহমানকে বলল, "সাইদুর সাহেব, আপনি আমাদের পিছনে নিজের পুরো জীবনটাই ব্যয় করে ফেললেন। বিয়ে পর্যন্ত করলেন না। প্রেম নিয়ে প্লেটোর গল্পটা শুনবেন?"

সাইদুর রহমান কিছু বলার আগেই লোকটি প্লেটোর গল্পটি বলে যেতে লাগল,

"আদিকালে মানুষের ছিল চার পা, চার হাত, চার চোখ, দুই মাথা, দুই মুখ ইত্যাদি। এক অংশ মেয়ে এক অংশ ছেলে। এরা ছিল খুব শক্তিশালী। এদের শক্তিমত্তা দেখে ভয় পেয়ে গেলেন মহান জিউস। তিনি করলেন কি, এদের আলাদা করে দিলেন। তাই দুনিয়াতে দ্বিখন্ডিত মানুষগুলো অপরখন্ডের অভাব অনুভব করে। এই পুনর্মিলনের আকাঙ্খাই প্রেম।"

প্লেটো নামের লোকটা একটু থেমে গিয়ে বলল, "আর আমার মনে হয় কি জানেন সাইদুর সাহেব? আদিতে আমরা এবং আপনি দুই খন্ড একসাথে ছিলাম। তাই কোথাও কিছু হলে আপনি আমাদের সন্দেহ করেন। সব জায়গায় স্পাই লাগিয়ে রেখেছেন। এদের বেতন দিয়ে দেশের যে কত টাকা নষ্ট হয় ভেবে আমার মাঝে মাঝে ঘুমই হয় না।"

সক্রেটিস নামের লোকটি হেসে বলল, "ভালো বলেছ, প্লেটো। তবে সাইদুর সাহেব আমরা সবাই আপনাকে খুব পছন্দ করি। আপনার মত শক্তিশালী কেউ আইন হাতে না

থাকলে আমাদেরও জীবনটা পানসে লাগত। যত যাই বলুন, লাইফ ইজ এবসার্ড। আর এবসার্ডিজমের সেই ফিলোসফি জানতে আপনাকে আমাদের ক্যামুর ক্লাসে আসতে হবে।"

সাইদুর রহমান জিজ্ঞেস করলে, "আপনাদের দেকার্তে কোথায়?"

প্লেটো বলল, "তার কথা আর জিজ্ঞেস করবেন না। সে নিজেকে নিয়ে খুব সংশয়ে আছে।"

সাইদুর রহমান আরো অনেকের খোঁজখবর নিলেন। বেশ কিছুদিন পর এদের সাথে দেখা। অপরাধী হলেও এরা অন্যরকম এবং এদেরকে ভালোমত না বুঝলে পাত্তাও পাওয়া যাবে না। যতটুকু সাইদুর সাহেব এগিয়েছেন তা এদের সাথে কথা বলা এবং ভাল জানাশোনার কারণেই।

কয়েকটা ব্যাপারে তার মারাত্মক কিছু সাফল্য আছে। যেমন একবার চার কোটি টাকার একটা ড্রাগ ডেলিভারী ধরতে পেরেছিলেন। সেগুলো এদের ছিল তিনি ধারণা করেন। কিন্তু এরা তবুও তার সাথে খারাপ ব্যাবহার করেনি। এর কারণ হিসেবে সাইদুর সাহেব মনে করেন তারাও তাকে সমীহ করে যেমন তিনি তাদের করেন ক্ষেত্রবিশেষে। তিনি এবং এরা একে অপরের শত্রু কিন্তু শক্তি দিয়ে পরস্পরের সমীহ আদায় করে নিয়েছেন। জীবনে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কূটনৈতিক সম্পর্কে যেতে হয়। সম্রাট আওরঙ্গজেব ৫০ বছরের উপরে রাজত্ব করেছেন।

নিজের তিন ভাইকে হত্যা করেছেন এবং বড় ভাই দারাশুকোর কাটা মাথা সোনার থালাতে সিল্কের কাপড় দিয়ে ঢেকে আগ্রার দুর্গে পিতা সম্রাট শাহজাহানের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সেই শক্তিশালী আওরঙ্গজেব রাজপুতদের চটাতে চাইতেন না, তাই তাকে যোধপুরী বেগমের মহলে টুপি খুলে প্রবেশ করতে হতো।

সারা শহরের অসংখ্য স্পাই নিয়োজিত করেছেন সাইদুর রহমান। গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়িয়েছেন মাদক চোরাচালান ও বিক্রি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে। শহরের সব মাদকের ব্যবসা এই সংগঠনের নিয়ন্ত্রনে বলেই তিনি মনে করেন।

সাইদুর রহমান এক সময় উত্তেজনার বশে সরাসরি আক্রমণ করতেন খুব। অনেক সময় ফাঁদে পড়েছেন। শরীরে গুলি লেগেছে। একটা অপারেশনে সাতজন তরুণ পুলিশ অফিসার নিহত হয়েছিল। এজন্য ডিপার্টমেন্টের উপরের স্তরে তাকে জবাবদিহি করতে হয়েছিল। তাই এখন তিনি নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে অপারেশন পরিচালনা করেন না আর।

আফসার উদ্দিন হত্যার সাথে এরা জড়িত কিনা সে সম্পর্কে আরো তথ্য জানতে গোয়েন্দাদের সাহায্য নিতে হবে। আফসার উদ্দিন যে এলাকায় ছিলেন, সেই ভাঙ্গা বাড়ির আশপাশে সন্দেহজনক কিছু বা কোন লোককে দেখা গিয়েছিল কি না তা জানা দরকার খুব। সাইদুর রহমানের আরেকটা সন্দেহ হচ্ছে লেখক আফসার

উদ্দিনের মানসিক অসুস্থতার ব্যাপারে। এই ফিলোসফাররা অনেক খুন করেছে বিষ খাইয়ে। এটা তাদের খুব প্রিয় এক পদ্ধতি। চায়ের সাথে বিষ মিশিয়ে খাওয়ানো। যেন সক্রেটিসকে হেমলক খাওয়ানো হচ্ছে। তারা এর নাম দিয়েছে বোধহয়, সক্রেটিক ডেথ।

লেখক আফসার উদ্দিনকে উন্মাদ বানাতে চায়ের সাথে কিছু এরা খাইয়েছে কিনা তাও দেখা দরকার।

সাইদুর রহমান গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধানকে ফোন করলেন।

ওপাশ থেকে শব্দ এল, "হ্যালো স্যার?"

"হ্যাঁ আহমদ সাহেব, একটা কাজ করুন। লেখক আফসার উদ্দিন যে বাড়িতে ছিলেন ওখানে তার সাথে কেউ কি দেখা করেছিল তা আমাকে জানান। খুব জরুরী।"

"স্যার, উনি তো মারা গেছেন...ওখানে আমাদের স্টেশনে তার ব্যাপারে বেশ কিছু তথ্য দেখেছিলাম..আমি আপনাকে আধঘন্টার মধ্যে জানাচ্ছি।"

"ঠিক আছে। রাখছি।"

আধঘন্টা লাগল না। মিনিট বিশেকের মধ্যে গোয়েন্দা কর্মকর্তা ফোন দিয়ে জানালেন একজন লোককে কয়েকবার আফসার সাহেবের রুমে যেতে দেখা গিয়েছিল তিনি উন্মাদ হবার কিছুদিন আগে।

সাইদুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন, "লোকটা কে? চিনতে পেরেছেন? স্কেচ কি আঁকতে পেরেছে ঠিকমত?"

ওপাশ থেকে কথা আসল, "চেনা যাচ্ছে না স্যার। যে তরুনটি দেখে ছিল সে ভাল আঁকে। তবে আমি চিনতে পারছি না। ডাটাবেজের কারো সাথে মিলেনি।"

ডাটাবেজের কারো সাথে মিলেনি শুনে সাইদুর রহমানের সন্দেহ আরো বেড়ে গেল। তিনি বললেন, "তাহলে আমার মোবাইলে পাঠিয়ে দিন ছবিটা।"

কয়েকমিনিটের মধ্যে ছবিটা চলে এল সাইদুর রহমানের মোবাইলে। ছবির দিকে চেয়ে সাইদুর রহমান স্থির হয়ে রইলেন। এ যে "পলোনিয়াস"। এই ফিলসফারদেরই একজন।

এই ফিলোসফারস তথা দার্শনিকেরা নামধারী সংগঠনের উৎপত্তি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতে পারেননি সাইদুর রহমান। আড়ালে থেকে অপরাধজগত নিয়ন্ত্রণ করে যায় এর কর্তাব্যক্তিরা। করে যায় অর্গানাইজড সব ক্রাইম। সেসব অপরাধের সাথে আবার তাদের সংশ্লিষ্টতার প্রমানও পাওয়া যায় না। নিঁখুত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তবে একটি ব্যাপার ভালো এদের। সমস্ত কার্যক্রম দেশভিত্তিক। বাইরের কোন সন্ত্রাসী সংগঠন বা অন্য কোন দেশের গোয়েন্দাদের দ্বারা এরা নিয়ন্ত্রিত নয়। ফলশ্রুতিতে কোন কোন ক্ষেত্রে, দেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে বিদেশী চরদের বিপক্ষে এদের সাহায্য নেয়া যায়। সাইদুর রহমান কয়েকবার নিয়েছেনও। এদের কর্তাব্যক্তি বা মূল ফিলসফারদের সম্পর্কে দেশের কোন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ডাটাবেজে

কোন তথ্য নেই। এ সম্পর্কে সাইদুর রহমানের নিজস্ব একটি ভাবনা আছে। তা হলঃ এরা খুব সম্ভবত ছিল খুব অগুরুত্বপূর্ন ছিন্নমূল কিছু মানুষ। রাষ্ট্র যাদের পরিচয় নিয়ে কখনও কোনদিন মাথা ঘামায় না। এইসব মানুষেরাই হঠাৎ কিছু প্রচন্ড প্রতিভাবান লোক পেয়ে যায় তাদের মধ্যে। একজন সুযোগ্য নেতা যেকোন ধরনের মানুষের দলকে সংঘটিত করতে পারেন। প্রকৃতি কাউকে কাউকে কিছু অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা দিয়ে পাঠায়। এদের সেই নেতা সক্রেটিস নামের লোকটি। পুরনো নাম ঝেড়ে ফেলে তারা নতুন নাম নিয়েছে যাতে তাদের পূর্বের পরিচয় কখনও জানা না যায়। এজন্যই হয়তো তারা সব সময় আড়ালে থাকে। জনচক্ষুর আড়ালে।

সব সন্ত্রাসীদেরই এক ধরনের ফিলোসফি বা নিজস্ব কিছু আদর্শিক চিন্তা থাকে। সেই মতাদর্শের ভিত্তিতে তারা একত্রিত হয়। এদের ক্ষেত্রে সেই মতাদর্শও সেরকম কিছু একটা হবে। কিন্তু এরা সবকিছুর একটি দার্শনিক মোড়ক ব্যবহার করে। এ থেকে তাদের সাংঘঠনিক গম্ভীরতারও পরিচয় পাওয়া যায়।

সাইদুর রহমান নিজের ডায়রীতে এই সংগঠনের সাংঘঠনিক একটা কাঠামো এঁকে রেখেছেন। এদের কার্যক্রমের সাথে দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত তিনি। তাই তার আঁকা কাঠামো চিত্র বা সাংঘঠনিক মানচিত্রের একটা গুরুত্ব আছে। যদি বলাবাহুল্য এই চিত্রটি অসম্পূর্ণ এবং প্রায় কাল্পনিকও বলা যায়।

সক্রেটিস

একাডেমিকস

ডি

অমনিবাস

অবিটেডাম

সিনিক

সেক্সিস্ট

এগজিসটেনশিয়ালিস্ট

ব্রেজর

সাইদুর রহমানের মতে,

প্রথমেই আছে সক্রেটিস বা এই গুপ্ত সংগঠনের প্রধান। সেই এদের দলনেতা এবং মূল দার্শনিক প্রেরণা। সম্ভবত এর প্ল্যানেই এবং প্রতিভার গুণেই এই শক্তিশালী দল গড়ে উঠেছে। কিছু মানুষ অসাধারন প্রতিভা নিয়ে জন্মায়। একে সেইসব প্রতিভাবানদের দলে ফেলা যায়। প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিক সক্রেটিসের জীবন নিয়ে তার জানাশোনা অনেক। নিজেকে সক্রেটিস নাম দেয়ার পাশাপাশি এই লোক মূল সক্রেটিস সম্পর্কেও অনেক জেনেছে। এর কাছেই প্রথমে সাইদুর রহমান জেনেছিলেন সক্রেটিস হলেন নেগেটিভ দার্শনিক। তিনি কোন পজিটিভ শিক্ষা দেননি। বিভিন্ন দার্শনিক বিষয়াবলী বা সমস্যা নিয়ে প্লেটোর ডায়লগসে অন্যদের সাথে তার যে কথাবার্তা দেখা যায় তার অনেকগুলো প্রশ্নের কথাবার্তা কোন সমাধানে যায় নি। সক্রেটিস শুধু প্রশ্ন করতেন। এমনভাবে প্রশ্ন করতেন যাতে মনে হবে, তিনি কিছুই জানেন না কিন্তু জানতে চান। যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে তাকে খুব করে প্রশংসাও করতেন। ফলশ্রুতিতে সেই ব্যক্তি সক্রেটিসের ফাঁদে পা দিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে যেত এবং ভয়াবহ বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখে পড়ত। অনেকসময় সক্রেটিসের বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নবানে জর্জরীত হয়ে স্থান ত্যাগ ব্যতিত তাদের অন্য কোন গত্যন্ত র থাকত না। তিনি তৎকালীন জ্ঞানীদের প্রশ্নে প্রশ্নে বিব্রত করে বেড়াতেন বলে নিজেকে বলতেন গ্যাডফ্লাই অফ এথেনস। গ্যাডফ্লাই এক ধরনের ডাঁশ পোকা যা ঘোড়াকে বিরক্ত করে।

সক্রেটিসের যেসব সমস্যাগুলো বা তর্কগুলো কোন সমাধানে পৌঁছাতে পারেনি সেগুলোকে বলা যায় এপোরিয়ায় বিলীন। এপোরিয়া হচ্ছে এমন এক অবস্থা যখন উত্তরদাতা কোন উত্তর বা যুক্তি খুঁজে পায় না।

সক্রেটিসের জ্ঞান ছিল এমন। কোন পজিটিভ কিছু না, নেগেটিভিটি।

সক্রেটিস তর্কে কোন পজিটিভ উত্তরে যাননি কিংবা নেগেটিভিটিতে থেমে গিয়েছিলেন বলে জার্মান আইডালিস্ট দার্শনিক হেগেল তার সমালোচনা করেছেন। কিন্তু একই কারণে ডেনমার্কের বিখ্যাত দার্শনিক ও আধুনিক অস্তি ত্ববাদের জনক সোরেন কির্কেগার্ড সক্রেটিসের প্রশংসা করেন।

সক্রেটিসকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছিল। সেই অভিযোগপত্র এই সক্রেটিস হুবহু ল্যাটিন ভাষায় বলে গিয়েছিল একবার সাইদুর রহমানের সামনে-

এই সক্রেটিস মূলত সব নিয়ন্ত্রণের কাজে থাকলেও তার ঠিক পরের স্তরে একাডেমিকস এর অবস্থান। এরা সক্রেটিসের ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয় এবং সক্রেটিসকে মন্ত্রণা দেয়। এই দলে যারা আছে তাদের নাম এরিস্টটল, প্লেটো, জেনোফ্যান ইত্যাদি। এরা সংখ্যায় ঠিক কতজন সঠিক জানা না গেলেও খুব বেশি না বুঝা যায়। এরপরে আছে দুই স্তর পাশাপাশি। সিনিকদের কাজ হচ্ছে পুরোপুরি ব্যবসায়ীক। লাভ-ক্ষতির হিসাব রাখা,

বিভিন্ন নতুন অবস্থার সাপেক্ষে সংগঠনের ব্যবসায়ীক কাজ কি হবে, অতীতের কাজ পর্যালোচনা, বিভিন্ন হিসাব নিকাশ ও তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষন, টেকনোলজিক্যাল এবং জ্ঞাননির্ভর যাবতীয় বিষয় দেখভাল করা। এরা এই ধরনের কাজ ব্যতিত আর কোন ধরনের কাজ করে না। তথ্য উপাত্তের সাপেক্ষে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে উপরের স্তরে অনুমোদনের জন্য প্রেরন করে। একাডেমিকেরা এদের বিশ্লেষনমূলক সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করে এবং সক্রেটিসের ইচ্ছানুযায়ী মূল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে।

সিনিকদের মধ্যে যারা থাকে তাদের নাম হয় প্রাচীন গ্রীসের সিনিক দার্শনিকদের নাম অনুসারে। যেমনঃ ডায়োজিনিস, এন্টিস্থিনিস, ইউক্লিড ইত্যাদি।

সিনিকদের ঠিক পাশাপাশি থাকা স্তরের নাম সোফিস্ট। এরা সিনিকদের থেকে ভিন্ন হলেও প্রায় একইরকম কাজ করে থাকে। তবে তাদের কাজ ব্যবসায়ীক না। আন্ডারওয়ার্ল্ডে ব্যবসা করতে হলে কোথায় শক্তি প্রয়োগ করতে হবে, কতটুকু করতে হবে, কোথায় অর্থ প্রয়োগ করা আবশ্যক ইত্যাদি বিষয়াবলী তারা দেখে থাকে। উল্লেখ্য, যাবতীয় খুন, গুম ইত্যাদি নৃশংস কাজগুলোর ও হিসাব নিকাশ এরাই করে। তারপর সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়ে অনুমোদনের জন্য উপরের স্তর অর্থাৎ একডেমিকদের কাছে প্রেরণ করে।

সোফিস্টদের নাম হয় প্রোটাগোরাস, জর্জিয়াস, কেলিক্লিস, থ্রেসিম্যাকাস ইত্যাদি প্রাচীন গ্রীসের সেই সোফিস্ট সম্প্রদায়ের দার্শনিকদের নামানুসারে।

একাডেমিকেরা এই স্তরের পাঠানো সিদ্ধান্ত বিশ্লেষন করে সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিয়ে থাকে সাধারণত। তাদের দ্বারা সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হবার পর আবার সোফিস্টদের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত যায় একজিসস্টেনশিয়ালিস্টদের কাছে। এরা অবস্থা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য রেজরদের নির্দেশ দেয়। একজিজস্টেনশিয়ালিস্টদের নাম হয় অস্তিত্ববাদী দার্শনিক-লেখকদের নামানুসারে। যেমন, সার্ত্রে, ক্যামু, কির্কেগার্ড, কাফকা, দস্তয়ভস্কি, নীৎসে ইত্যাদি।

রেজরের নির্দেশ দেয় সাধারণ বাহিনীকে। এই বাহিনী ভাড়াটে না তাদের নিজস্ব বা তাদের সংখ্যা কত জানা যায় না। রেজরদের কাজ খুব সরাসরি কাজের নির্দেশ দেয়া এবং কাজের তদারক করা। এসব কাজের মধ্যে খুন অন্যতম প্রধান। এদের নামকরনের অনুপ্রেরনা সম্ভবত নমিনালিজম বা নামবাদের প্রবক্তা উইলিয়াম অব ওকাম এর "ওকামের ক্ষুর বা ওকাম'স রেজর ল"। এর মর্মকথা হল- "বিনা প্রয়োজনে বস্তুসংখ্যা বৃদ্ধি করা অনুচিত। যত কম অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তত ভাল।"

আরেকটি স্তর আছে যা সক্রেটিস এবং সিনিক, সোফিস্ট, একাডেমিক্স ও একজিসস্টেশিয়ালিস্টদের বিভিন্ন

কাজকর্মের যৌক্তিকতা নিয়ে সমালোচনা ও প্রশ্ন করে থাকে। এই স্তরের নাম ডি অমনিবাস ডাবিটেন্ডাম। এদের কাজটা আসলে কি তা জানা যায় না ঠিকমত। তবে খুব সম্ভবত এরা খুব বড় ধরনের বিপদে সক্রেটিস এবং অন্যদের সাহায্য করে থাকে। সাইদুর রহমান এদের কখনও দেখেননি, নাম শুনেছেন সক্রেটিসের মুখে। ডি অমনিবাস ডাবিটেন্ডাম একটি ল্যাটিন কথা, বলা হয়ে থাকে এটি বলেছেন দার্শনিক রেনে দেকার্তে। এর অর্থ হল 'লেট আস ডাউট এভ্রিথিং।'

সাইদুর রহমান এদের সব স্তরকে দেখেননি। কয়েক স্তরের দুয়েকজনকে মাত্র দুয়েকবার দেখেছেন। সরাসরি উপরের স্তরের কর্তারা নির্দ্বিধায় তার সাথে দেখা করতে পারে কারণ যদিও তারা সবকিছুর পিছনে তথাপি এত স্তরে স্তরে একেকটা নির্দেশ যায় যে, তাদের সংশ্লিষ্টতার কোন প্রমাণ থাকে না। কিন্তু রেজরদের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ হয়তো থাকে। তাই তারা সবচেয়ে বেশি গোপনে থাকে।

সংঘবদ্ধ অপরাধ সংগঠনের প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য হল তাদের কিছু বৈধ ব্যবসা থাকে। যেমন, মাদক বা সোনা চোরাচালান থেকে অর্জিত টাকা ব্যবহার করবে অন্য কোন বৈধ ব্যবসায়। এরকম বৈধ ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে সামাজিক মর্যাদা এরা অর্জন করে থাকে। কিন্তু এই সংগঠনের ক্ষেত্রে সেরকম কোন বৈধ ব্যবসার খোঁজ পাননি

সাইদুর রহমান। পাওয়া গেলে দেখা যেত তাদের বৈধ অংশের দায়িত্বে কে বা কারা আছেন।

লেখক আফসার উদ্দিন যে ভাঙ্গা বাড়িতে ছিলেন তার আশপাশে যে লোকটিকে দেখা গিয়েছিল অর্থাৎ সাইদুর রহমান যার ছবি দেখে চিনেছেন পলোনিয়াস, সেই পলোনিয়াস এই দার্শনিকদের গ্রুপেই ছিল। খুব সম্ভবত একাডেমিক্স স্তরে সে ছিল। সাইদুর রহমান তাকে বেশ কয়েকবার দেখেছেন সক্রেটিস এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের সাথে।

সাইদুর রহমান তার চৌকস কিছু লোককে লাগালেন পলোনিয়াসের খোঁজ করতে। আর ওদিকে তিনি ঠিক করলেন আরেকবার যাবেন সক্রেটিসের সাথে দেখা করতে। সেই দেখা করার প্রক্রিয়া বেশ জটিল। আগে থেকে মোবাইলে বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংকেত পাঠাতে হয় এবং তারপর একটি নির্দিষ্ট জায়গায় যেতে হয় তাদের নির্দেশ মত। সেই জায়গা থেকে তাদের লোকেরা এসে নিয়ে যায়।

এছাড়াও আরো অনেক প্রযুক্তি নির্ভর নিরাপত্তার ব্যবস্থা রেখেছে এরা। এ ব্যাপারে তারা খুব সচেতন। সাইদুর রহমান অনেকবছর ধরে এদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মিটিং করেছেন। কখনও তাদের নিরাপত্তা নিয়ে কোন গাফিলতি দেখেননি। তারা একটুও ভুল করেনি বা তাকে খুব সামান্য সুযোগও দেয়নি।

এর আগে কখনও এদের একেবারে উপরের স্তরের কেউ কোন অপরাধের সাথে এভাবে জড়িত হতে দেখা যায়নি। সাইদুর রহমান বেশ খানিকটা অবাক এই পলোনিয়াসের ব্যাপারটায়। তবে ভেতরে ভেতরে তিনি প্রবল উত্তেজনা অনুভব করছেন। কারণ পলোনিয়াসের সংশ্লিষ্টতা প্রমাণ হলে এদের সাংঘটনিক কর্তাদের সবার সংশ্লিষ্টতা প্রমাণ হয়ে যায়। আর এই প্রমাণটা করতে পারলেই এদের কর্তাদের বিরুদ্ধে মেজর কোন স্টেপ নেয়ার ব্যাপারে অনেক বাঁধাই দূর হয়ে যাবে।

সেদিন রাতে সাইদুর রহমান ফিলোসফারদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের কথামত তার বাসার কিছু দূরে দাঁড়িয়ে থাকেন। কিছুক্ষন পর একটা গাড়ি এসে তাকে তুলে নিয়ে যায়।

তিনি দেখা করতে চাইলে, একেকবার একেক জায়গা থেকে এবং প্রায় নতুন পদ্ধতি অনুসরন করে তাকে নিয়ে আসা হয়। এমনি নিরাপত্তা ব্যবস্থা। সাইদুর রহমান এর সাথে পরিচিত। তাই তার কোন রকম অস্বস্তিবোধ হচ্ছিল না।

মধ্যরাতে তার এবং সক্রেটিসের মধ্যে কথা হল। এই প্রথম দেখা গেল লোকটির মুখ গম্ভীর। সাইদুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি বলেছিলেন লেখক হত্যার সাথে আপনারা সম্পৃক্ত না। কিন্তু আমার লোকদের রিপোর্ট তো ভিন্ন কথা বলে।"

সক্রেটিস গম্ভীর মুখে বলল, "আপনার লোকদের রিপোর্ট কি বলে?"

সাইদুর রহমান বললেন, "বলে যে আপনাদের লোক পলোনিয়াস, যাকে আমি বেশ কয়েকবার দেখেছিলাম এখানে, সে আফসার উদ্দিন হত্যার সাথে জড়িত।"

সক্রেটিসের মুখভঙ্গির কোন পরিবর্তন হল না। সে আগের মতই বলল, "তাতে কি প্রমান হয় আমরা জড়িত?"

সাইদুর রহমান বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "প্রমান হয় না? আপনারা তো বিচ্ছিন্ন নন।"

সক্রেটিস একটু ঝুঁকে এসে বলল, "সাইদুর সাহেব, আপনার আগে খোঁজ নিয়ে দেখা উচিত ছিল সে আমাদের সাথে এখনো যুক্ত আছে কিনা।"

সাইদুর রহমান অবাক এবং কিছুটা রাগী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, "তার মানে? আমি তো জানি আপনাদের এখানে যারা যোগ দেয় তারা ছেড়ে যেতে পারে না। তাছাড়া সে খুব উঁচু স্তরেই ছিল। এখন কি আপনারা তাকে অস্বীকার করলেই পার পেয়ে যাবেন ভেবেছেন?"

সক্রেটিস গাঢ় স্বরে বলল, "দেখুন সাইদুর সাহেব, আপনি আমাদের সম্পর্কে অনেক ভুল জানেন। তার চেয়ে বেশি ভুল চিন্তা করেন। আমাদের এখানে যুক্ত হলে কেউ ছেড়ে যেতে পারে না এটি ভুল কথা। আসলে কেউ যায় না। কিন্তু যেতে চাইলে আমরা বাঁধা দিতে পারি না। আর পলোনিয়াসের সাথে আমাদের দীর্ঘদিন কোন সম্পর্ক নেই। তার খবরও আমরা জানি না।"

সাইদুর রহমান রেগে গিয়ে বললেন, "খবর জানেন না? অবিশ্বাস্য! সে যে আফসার উদ্দিনকে হত্যা করেছে সেটা নিশ্চয়ই জানেন?"

সক্রেটিস গম্ভীর গলায় বলল, "আসলে পলোনিয়াস এবং আমাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছিল। সে তার নৈরাশ্যবাদী এবং বিষাদের দর্শনকে খুব গুরুত্ব দিত। তা প্রচার করতে চাইত। এ নিয়ে তার সাথে আমাদের সমস্যা হয়। সে দার্শনিক হেগেসিয়াসের মতাবলম্বী ছিল। দার্শনিক হেগেসিয়াসকে নৈরাশ্যবাদী দর্শন প্রচারের জন্য আলেজান্দ্রিয়ায় তার ভাষণ নিষিদ্ধ করা হয়। জীবনের চাইতে মৃত্যু ভালো- এমন সব কথাবার্তা। জীবন সম্পর্কে এমন তিক্ত ধারণা তিনি তৈরী করেছিলেন যে তখনকার যুবকেরা আত্মহত্যায় প্রলুব্ধ হয়। পলোনিয়াস ছিল এমনই। তাকে আমাদের এখানে রাখা তাই সম্ভব ছিল না। সে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল।"

সাইদুর রহমান বেশ উত্তেজিত হয়ে বললেন, "আমি আপনার এই কথা বিশ্বাস করলাম না। নৈরাশ্যবাদ আপনারাও প্রচার করেন। ড্রাগ ডিলিং এর যৌক্তিকতা নিয়ে কি বলেছিলেন মনে নেই?

সক্রেটিস গম্ভীর হয়ে বলল, "হ্যাঁ। মনে আছে। কিন্তু দুটি ভিন্ন বিষয়। আর মাদক বাণিজ্যের সাথে আমাদের সম্পৃক্ততা আপনি দেখাতে পারেননি। আপনি আমাদের শুধু সন্দেহ করে যাচ্ছেন।"

সাইদুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন, "যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন ওটা কি নৈরাশ্যবাদ নয়?"

সক্রেটিস ঠাণ্ডা গলায় বলল, "না। আপনি ভালোমত শুনলে বুঝবেন। আমি বলেছিলাম মিথ অফ সিসিফাসের কথা। সিসিফাস সেই প্রাচীন গ্রীস তথা দেবতা জিউসের যখন রাজত্ব তখন এক ছোট রাজ্যের রাজা ছিল। জিউস এসোপাসের মেয়ে এজিনাকে হরণ করেছিলেন। সিসিফাস তা দেখতে পায় এবং এসোপাসকে বলে দেয়। ফলশ্রুতিতে রেগে যান দেবতাধিপতি জিউস। তিনি থানাটোসকে পাঠান সিসিফাসকে শাস্তি দিতে। তার শাস্তি হলো শিকলে বেঁধে তাকে টারটারাসে রাখা হবে। টারটারাস এক অন্ধকার ভয়াবহ স্থান।

থানাটোস পৃথিবীতে গিয়ে সিসিফাসকে ধরে আনল। তাকে টারটারাসে নিয়ে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে যাবে এমন সময় সূক্ষ্ম বুদ্ধির চালে সিসিফাস উল্টা থানাটোসকে বন্দি করে ফিরে যায় পৃথিবীতে।

থানাটোস মানুষের জান নেয়ার কাজে নিয়োজিত থাকত। ফলে সে অন্ধকার টারটারাসে বন্দি হওয়ায় পৃথিবীতে মানুষের মৃত্যু বন্ধ হয়ে গেল।

যাইহোক, পরে এই সিসিফাসকে ভয়াবহ শাস্তি দেয়া হয়। সেই শাস্তি হল একটি বিশাল পাহাড়ে সে বিরাট এক পাথরকে টেনে তুলবে। সে পাথর আবার গড়িয়ে নিচে

পড়বে। আবার সে তুলবে। এভাবে চলবে অনন্তকাল। এটাই তার শাস্তি। সিসিফাসের মিথ।

আমি বলেছিলাম, আমাদের সবার জীবনই এইরকম। মিথ অব সিসিফাসের মত। পাহাড়ে পাথর টেনে তোলা, অর্থহীন। এ ব্যাপারে আলবেয়ার ক্যামু বলেছেন, সিসিফাস পাথর গড়িয়ে তুলে সে যখন উপরে উঠে দেখবে পাথর পড়ে যাচ্ছে তখন সে দুঃখিত হবে না। বরং খুশিই হবে। কারণ দুঃখিত হলে এই জীবন তার কাছে হবে দুঃসহ, আত্মহত্যাই হবে সমাধান। আমরা মানুষেরা পাথর টেনে তুলে যখন দেখি গড়িয়ে পড়ছে অর্থাৎ জীবনের অর্থহীনতা অনুভব করলেও জীবনে ছোট ছোট বিভিন্ন ব্যাপার নিয়ে সুখী থাকি। এজন্যই আত্মহত্যা করি না।

আর যেহেতু জীবন অর্থহীন সুতরাং এখানে ক্ষুদ্র সুখের জন্য কেউ মাদকের সাহায্য নিতেই পারে। অথবা একই ব্যবসা করতেই পারে। কিন্তু এ তো তাকে আত্মহত্যায় প্রলুব্ধ করছে না।"

কিন্তু পলোনিয়াস বলত, "মানুষের আত্মহত্যা করা উচিত। তার মতে মিথ অব সিসিফাসের যে ব্যাখ্যা ক্যামু বা আমরা মনে করি তা হচ্ছে 'বাস্তব ব্যাখ্যা'। অর্থাৎ যা ঘটছে তার ব্যাখ্যা। কিন্তু বাস্তব সব সময় সঠিক বা সত্য নাও হতে পারে। ফলে সরাসরি যা ঘটছে শুধুমাত্র সে অনুসারে ব্যাখ্যা দেয়ার অর্থ সত্য লুকানো, যে সত্য অস্বস্তিকর। কিন্তু অস্বস্তিকর হলেও সত্য সত্যই।

ফলশ্রুতিতে, তার ব্যাখ্যা ছিল অর্থহীন জীবন বয়ে বেড়ানোর কোন মানে নেই।"

দীর্ঘ বক্তৃতার পর সক্রেটিস সাইদুর রহমানের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

তারপর আবার বলল, "এছাড়া তার আরো কিছু সমস্যা আছে। সে বেশ কিছু প্রাচীন ব্যাপার নিয়ে অতিমাত্রায় আগ্রহী। এবং সে আসলে ভয়ংকর।"

সাইদুর রহমান কিছু বললেন না। হয়তো সত্যিই এদের সাথে পলোনিয়াস এখন নেই। অথবা হয়তো আছে। কিন্তু সব জানা যাবে খুব শীঘ্রই। চারিদিকে লোক লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।

সাইদুর রহমান সক্রেটিসের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলো একেডেমীকদের একজন। নাম বা ছদ্মনাম এরিস্টটল। সাইদুর রহমান যখন ঠিক দরজার কাছে তখন এরিস্টটল বলল, "খুব আট ঘাট বেঁধে নেমেছেন এবার বুঝা যাচ্ছে।"

সাইদুর রহমান কিছু বললেন না।

এরিস্টটল বলল, "কিন্তু সাবধান থাকবেন। খুব সহজ কিছু নিয়ে ডিল করছেন না কিন্তু। রাশিয়া জার্মানির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে একটা অপারেশন করেছিল কুকুর নিয়ে। নাম এন্টি ট্যাংক ডগস। কুকুরকে ট্রেনিং দেয়া হয়েছিল যাতে তারা বোমা নিয়ে বিপক্ষের ট্যাংকের নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রাশিয়ানরা তাদের কুকুরদের ট্রেনিং

দিয়েছিল নিজেদের ডিজেল চালিত ট্যাংক ব্যবহার করে। আর জার্মানীর ট্যাংক ছিল গ্যাসোলিন চালিত। কুকুরদের তো আবার ঘ্রানশক্তি প্রবল। তারা যুদ্ধক্ষেত্রে বোমা নিয়ে রাশিয়ার ডিজেল ইঞ্জিন ট্যাংকেই ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করল। হা হা! তাই খেয়াল রাখবেন যাতে আপনার এত আয়োজন না আবার নিজের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হয়।"

এই কথায় লোকটি কি বুঝাতে চাইল সাইদুর রহমান চিন্তা করলেন খুব অল্প সময়। তারপর বিদায় জানিয়ে গাড়িতে উঠলেন। গাড়িতে কালো মাস্ক পড়া দুজন লোক। এরা তাকে খুব সম্ভবত তার বাসায় পৌঁছে দিবে। তবে সাইদুর রহমানের অস্বস্তি হতে শুরু করল কিছুটা। এদের যদি তাকে নিয়ে অন্য কোন প্ল্যান করে থাকে!

সপ্তম অধ্যায়

সাইদুর রহমান চারিদিকে লোক লাগিয়েছিলেন পলোনিয়াসকে খুঁজে বের করার জন্য। তার তৈরী বিশেষ বাহিনীর সদস্যরা চৌকস। সারা শহরে তাদের নজরদারী বিদ্যমান। তাই খুব বেশি সময় অপেক্ষা করতে হল না। প্রায় চার ঘন্টা পর সাইদুর রহমান ফোন পেলেন, পলোনিয়াসকে দেখা গেছে। শহরের মানিকপীরের টিলায় অবস্থিত সবচেয়ে বড় গোরস্থানের গেটের পাশে বসে দাড়োয়ানের সাথে কথা বলছিল।

সাইদুর রহমান তৎক্ষণাত গোরস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কিন্তু গিয়ে তিনি পলোনিয়াসকে দেখতে পেলেন না। তার লোকেরা বলল, 'পলোনিয়াস কিছুক্ষণ আগে গোরস্থানের ভিতরে প্রবেশ করেছে। তার হাতে একটি বড় কালো ব্যাগ ছিল।'

সাইদুর রহমানের অন্যত্র কিছু কাজ ছিল। তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তার বাহিনীর লোকদের বললেন, 'তোমরা পলোনিয়াসের জন্য অপেক্ষা কর। সে বের হলে আমাকে জানাবে। আমি এখন চলে যাচ্ছি।'

সারা সন্ধ্যা এমনকি অর্ধেক রাত পর্যন্ত লোকগুলো দাঁড়িয়ে ছিল। সাইদুর রহমান বার বার ফোন দিয়ে খোঁজ

নিলেন। কিন্তু পলোনিয়াস বের হয়নি। একবার এক তরুন অফিসার একজন তাকে জিজ্ঞেস করল, 'স্যার, আমরা কি দাড়োয়ানকে গিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করব?'

সাইদুর রহমান বললেন, "না। দাড়োয়ানের সাথে পলোনিয়াসের জানাশোনা আছে। সুতরাং দাড়োয়ানকে কিছু জিজ্ঞেস করলে পলোনিয়াস সাবধান হয়ে যাবে। সে হয়তো জানেনা আমরা তাকে ফলো করছি। তাই অপেক্ষা করে থাকো। গোরস্থানের পেছন দিকের গেট দিয়ে সে সম্ভবত বের হয়ে গেছে। তবুও সব পথে লোক লাগিয়ে রাখো। আমার ধারণা সে আবার আসবে। তার ব্যাগে কি ছিল ধারনা করতে পারো?"

তরুণ অফিসার বলল, "স্যার, যখন সে গেটে এসেছিল তখন ব্যাগ পূর্ণ ছিল। এর ভিতরে কাপড় জাতীয় কিছু থাকতে পারে।"

পলোনিয়াসকে সেদিন আর দেখা গেল না। দেখা গেল পরদিন বিকেলে। পলোনিয়াস আবার এল। গোরস্থানের দাড়োয়ানের সাথে কিছুক্ষণ আলাপ করল। তারপর দাড়োয়ানের পকেটে কিছু টাকা কিংবা কাগজ গুজে দিয়ে গোরস্থানের ভেতরে চলে গেল।

এক অফিসার ফোন দিল সাইদুর রহমানকে, "স্যার, লোকটা এসেছে আবার। এইমাত্র গোরস্থানে প্রবেশ করেছে। আমরা কি করব?"

সাইদুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন, "আজ কি কি করেছে?"

অফিসার বলল, “সে এসে কিছুক্ষণ দাড়োয়ানের সাথে কথা বলেছে। তার পকেটে কাগজ বা টাকা গুঁজে দিয়েছে। এরপর ভিতরে প্রবেশ করেছে।”

সাইদুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন, “হাতে ব্যাগ ছিল?”

অফিসার উত্তর দিল, “আজ ব্যাগ ছিল না। তবে আজ তার মাথায় লাল হ্যাট ছিল।”

সাইদুর রহমান বললেন, “একজন দ্রুত গোরস্থানে প্রবেশ করে তাকে ফলো করতে থাকো। আর আমাকে আপডেট জানাও।”

অফিসার ফোন রেখে আরো কয়েকজনকে নির্দেশ দিল। নিরীহ চেহারার একজন অফিসার দাড়োয়ানের অনুমতি নিয়ে কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্য দেখিয়ে গোরস্থানের ভেতরে প্রবেশ করল।

গোরস্থান বিশাল আকৃতির। এর একটা অংশ টিলার উপরে। টিলার জন্যই এর নামকরণ কিন্তু বড় অংশ সমতলে। আকৃতি ইংরেজি টি অক্ষরের মত। প্রথমে সোজা রাস্তা। দুপাশে সারি সারি কবর। এভাবে মিনিট দুয়েক নাক বরাবর হাঁটার পর দেখা যাবে দুদিকে চলে গেছে দুটি পথ। কিছু দূরে দূরে বিশাল বিশাল সব বোর্ড। সেসব বোর্ডে ম্যাপ আঁকা আছে। ম্যাপে নির্দেশ করা আছে কোথায় কত নাম্বার কবর। এই বোর্ডগুলোর সাহায্য না নিয়ে কোন নির্দিষ্ট কবর খুঁজে বের করা বেশ দুরূহ।

হাসিব বেশ ঝামেলায় পড়ে গেল। গোরস্থানের নিরবতা এমনিতেই তার ভালো লাগে না। এই চাকরিও ভালো লাগে না। পুলিশে যোগ দিয়েছিল কারণ তার অন্য একটি উদ্দেশ্য আছে। সে সুযোগের অপেক্ষায় আছে এবং নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছে। পেশাগত জীবনে শুরুতেই দক্ষতার ছাপ রাখতে শুরু করে সে। ফলে সাইদুর রহমানের স্পেশাল বাহিনীর জন্য মনোনীত হয়। সাইদুর রহমান এই বাহিনী তৈরী করেছেন বিশেষ এক আইনের সাহায্য নিয়ে এবং তার উদ্দেশ্য শহরের আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করা আরো ভালোভাবে। কিন্তু হাসিবের মাঝে মাঝেই মনে হয় সাইদুর রহমানের অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। এজন্যই এত আয়োজন। হয়তো এমন কোন কিছুর পিছনে তিনি ছুটছেন যা কেবল উপরের স্তরের কর্তাব্যক্তিরাই জানেন।

হাসিব খুব সাবধানে সোজা রাস্তা ধরে কিছুদূর গিয়ে এসে চারপাশে তাকাল। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। দূরে রাস্তা যেখানে টি শেপে বাঁক নিয়েছে সেখানে সে দৌড়ে গিয়ে বামে এবং ডানে তাকাল দ্রুত। লোকটাকে মিস করলে চলবে না।

ডানদিকে তাকানোর সময় লক্ষ্য করল, লোকটি খুব সাধারণভাবেই গেট দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে।

হাসিব অবাক হল লোকটি কত দ্রুত হেঁটেছে ভেবে। সে প্রায় সাথে সাথে এসেও তাকে দেখতে পেয়েছে বেরিয়ে যাবার সময়।

সে একজন অফিসারকে ফোন দিয়ে বলল, "স্যার লোকটাকে এইমাত্র পিছনের গেট দিয়ে বের হতে দেখলাম। সে বোধহয় শর্টকার্ট রাস্তা ব্যবহারের জন্য গোরস্থানের ভিতর দিয়ে হেঁটে গেছে।"

পেছনের গেটে লোক লাগানো ছিল। পলোনিয়াস বের হতেই তারা পিছু নিল।

পলোনিয়াস কিছুদূর গিয়ে একটি ট্যাক্সি নিল। পুলিশের লোকেরাও গাড়িতে করে তাকে ফলো করা শুরু করল। প্রায় আধঘন্টা চলার পর শহরের বাইরের দিকে প্রায় নতুন একটি কাঠের বাড়ির সামনে এসে পলোনিয়াসের গাড়িটি থামল। পলোনিয়াস গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভারকে ভাড়ার টাকা দিল।

পুলিশের লোকেরা একটা ঝোপের পাশে তাদের গাড়ি দাঁড় করিয়েছিল। একজন অফিসার সাইদুর রহমানকে ফোন দিল, "স্যার লোকটার বাড়ি আমরা খোঁজ পেয়েছি। এখন কি করব? তাকে এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে ধরা যাবে।"

সাইদুর রহমান বললেন, "এখন ধরে কাজ নেই। প্রথমত কিছুদিন একে ফলো করতে হবে। কি করে, কোথায় যায় ইত্যাদি দেখতে হবে। তাহলে অনেক কিছু

জানা যাবে বলে মনে হচ্ছে। হুট করে ধরলে ঝামেলা হয়ে যাবে।"

অফিসার বলল, "তাহলে কি আমরা এর বাসার পাশেও লোক লাগাব?"

সাইদুর রহমান বললে, "হ্যাঁ। সবখানে। এক সপ্তাহ একে ফলো করো। তারপর রিপোর্ট এনে আমাকে দেখাবে।"

সাইদুর রহমানের প্রশিক্ষিত বিশেষ বাহিনীর তিনজন লোক পলোনিয়াসের বাড়ির পাশের ঝোপে বসে রইলো। পলোনিয়াসের বাড়িটির সব দরজা জানালা বন্ধ। ভেতরে কোন আলো বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না। এমনকী কোন সাড়াশব্দও নেই।

রাতেও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না বাড়ি থেকে। কিছু দূরে একটা ঝোপের ধারে বসেছিল তিনজন বিশেষ বাহিনীর সদস্য। হাসিব তাদের একজন। তাদের এরকম পরিস্থিতিতে কাজ করার ব্যাপারে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। সুতরাং কোন সমস্যা হচ্ছিল না। শুধু হাসিব ভাবছিল এই লোকটাকে নিয়ে। কেন সে এত গুরুত্বপূর্ণ। এখন পর্যন্ত লেখক আফসার উদ্দিন মৃত্যুর সাথে এর তেমন কোন সম্পর্কও খোঁজ পাওয়া যায়নি। অথবা হয়তো পাওয়া গেছে কিন্তু সবাইকে জানানো হয়নি। এই ব্যাপারটা হাসিবের ভালো লাগেনা। বাহিনীর সব সদস্যকে সব কিছু বলা হয়না। অনেক গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

এরকম বিভিন্ন ধরনের ভাবনা মাথায় নিয়ে তিনজন পুলিশের বিশেষ বাহিনীর সদস্য নিঃশব্দে পুরো রাত পলোনিয়াসের বাড়িটির দিকে লক্ষ্য রাখল। মাঝে মধ্যে অফিসারদের জানাতে হচ্ছিল কি অবস্থা। অবস্থা আসলে তেমন কিছুই ছিল না। অন্ধকারে কয়েকটি শেয়ালের ডাককে যদি বিশেষ কিছু ধরা না হয়, তাহলে বলা যায় সন্ধ্যারাত থেকে পুরো রাতই অবস্থা ছিল একইরকম। পলোনিয়াসের ঘর থেকে কোন শব্দ শোনা যায়নি,তার বাড়িতে কেউ আসেনি কিংবা সেও বের হয় নি।

পরদিন সকাল দশটার দিকে সে বের হল। পড়নে সাদা শার্ট এবং শাদা প্যান্ট। সে বাড়ি থেকে বের হয়ে সোজা রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। বিশেষ বাহিনীর সদস্যেরা কিছু দূরত্ব অবলম্বন করে তার পিছু নিল। মিনিট দুয়েক হাঁটার পর মূল রাস্তা। রাস্তার একপাশে একটি সস্তা রেস্তোরা। পলোনিয়াস রেস্তোরায় প্রবেশ করে সকালের নাস্তা করল। তারপর সোজা রাস্তা ধরে মিনিট বিশেক হেঁটে পৌছালো শহরে। সেখানে সে আরো একঘন্টা উদ্দেশ্যহীনভাবে এখানে ওখানে ঘুরলো। এইসময় তাকে দূর থেকে ফলো করতে করতে একবার হাসিবের মনে হল লোকটা কি তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে! অনেক সময় ঘাগু অপরাধীরা যখন বুঝতে পারে গোয়েন্দা পুলিশ ছদ্মবেশে তাদের পিছু নিয়েছে তখন তারা উদ্দেশ্যহীন কিছু কার্যকলাপের মাধ্যমে পুলিশকে বিভ্রান্ত করতে চায়।

হাসিব এবং পুলিশের অন্য দুজন সদস্য যখন পলোনিয়াসকে ফলো করতে করতে প্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল তখন পলোনিয়াস একটি সিনেমা হলে প্রবেশ করল। আর বাইরে অপেক্ষা করে বসে রইল পুলিশের লোকেরা।

পলোনিয়াস বের হল প্রায় দুঘন্টা পরে। সে সিনেমা হলের পাশে একটি রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাবার খেল।

এরপর সে সোজা উত্তর দিকে হাঁটতে শুরু করল। সে খুব দ্রুত হাঁটতে পারে। প্রায় বিশ মিনিট একটানা হাঁটার পর বিদেশী দোকানের হাট নামক একটা জায়গায় এসে থামল সে। বাণিজ্যমেলায় যেমন বিভিন্ন দেশের দোকানের স্টল থাকে তেমনি এখানেও আছে। কিন্তু এখানের দোকানগুলো সবসময় থাকে। ঐসব দেশের ঐতিহ্যবাহী জিনিসপত্রের মাটির বা কাঠের সংস্করণ এখানে বিক্রি হয়। দোকানগুলোর মালিকেরাও বিদেশী। এরা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করে আসছে। প্রসার খুব একটা নেই।

মিশর, ভারত, নেপাল, চীন ইত্যাদি দেশের আলাদা আলাদা দোকান আছে। এগুলোতে মাঝে মাঝে শৌখিন মানুষেরা আসেন এটা ওটা কেনার জন্য। পলোনিয়াস একটি মিশরীয় দোকানের সামনে গিয়ে থামল। তারপর হঠাৎ করে অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে সে পিছন ফিরে তাকাল। আরেকটুর জন্য পুলিশের তিনজন লোককে দেখে ফেলেছিল। হাসিব ক্ষীপ্রগতিতে বাকি দুজনকে নিয়ে

পাশের এক জাপানি দোকানে প্রায় ঝাঁপিয়ে ঢুকে পড়ায় রক্ষা।

খুব দ্রুত ঢুকতে গিয়ে দোকানের সাজানো জিনিসপত্রের উপর পড়ে গিয়েছিল তারা। স্যরি বলেও কাজ হয়নি। খুশি করতে নগদ পয়সা খরচ করে জাপানি হস্তশিল্পের দু'টি নিদর্শন কিনতে হল।

কেনাকাটার পর তারা বের হয়ে দেখল পলোনিয়াস নেই।

হাসিব প্রায় দৌড়ে গেল মিশরীয় দোকানটার সামনে। তারপর কোন কিছু না ভেবেই ভেতরে ঢুকে পড়ল। সে ভেতরে ঢুকে চারপাশে তাকাচ্ছিল পলোনিয়াসের খোঁজে।

একজন কর্মচারী বলল, "আসুন স্যার! আপনি কিছু খোঁজছেন?"

হাসিব বলল, "হ্যাঁ...

ঠিক তখন সে দেখতে পেল মিশরীয় দোকানের মালিকের সাথে এক কোণের একটা টেবিলে বসে কথা বলছে পলোনিয়াস। টেবিলে একটি বই খোলা অবস্থায়। সেখানে কিছু ছবি আঁকা ছিল। সম্ভবত কাঠপেন্সিল জাতীয় কিছু দিয়ে। পলোনিয়াস সে ছবিতে কিছু একটা দেখিয়ে লোকটিকে কিছু বলছিল।

হাসিব আরো দেখত। কিন্তু কর্মচারী তাকে তাগাদা দিল, "স্যার, আপনি কি মিশরীয় মমি খুঁজছেন?"

হাসিব বলল, "হ্যাঁ...হ্যাঁ। মমি। ছোট সাইজের। আছে আপনাদের কাছে?"

কর্মচারী লোকটি সেলফ থেকে একটি আট ইঞ্চি সাইজের মমি এনে হাসিবের মুখের সামনে ধরে বলল, "এরকম হবে স্যার। এটা বালকরাজা তুতানখামেনের মমি। কথিত আছে তিনি হাঁটুতে আঘাত পেয়ে মারা যান।"

কর্মচারী সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এছাড়া পলোনিয়াসও এদিকে তাকাচ্ছে। সুতরাং হাসিব বুঝতে পারল পলোনিয়াসের দিকে তাকালে সন্দেহ করতে পারে। এছাড়া সে যেভাবে ঘুরে তাকিয়েছিল দোকানে প্রবেশ করার আগে, তাতে হয়তো সে কিছু আঁচ করতে পেরেছে। অথবা আঁচ করতে না পারলেও তার মনে হয়েছে হয়তো কিছু পিছনে। বেশিরভাগ মানুষই পেছন থেকে কেউ ফলো করলে অবচেতনে বুঝতে পারে।

সুতরাং, হাসিব ঝুঁকি নিল না। সে ছোট মমিটা কিনে বের হয়ে গেল।

বের হয়ে বাকি দুই সদস্যকে নিয়ে দোকানের পাশে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল প্রায় তিনঘন্টা। এরপর পলোনিয়াস বের হল। আবার তাকে ফলো করা শুরু হল। এবার সে গেল সেই মানিকপীরের টিলার গোরস্তানে। সেখানে গিয়ে গোরস্তানের দাড়োয়ানের সাথে কিছুক্ষণ গল্প করল। এরপর একটা ট্যাক্সি নিয়ে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বাড়িতে ফিরে এল।

এক সপ্তাহ পর পলোনিয়াসকে ফলো করে বিশেষ বাহিনী রিপোর্ট হস্তান্তর করল সাইদুর রহমানের কাছে। রিপোর্টের মধ্যে অনেক তথ্য ছিল। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলঃ

সকাল দশটার দিকে পলোনিয়াস ঘর থেকে বের হয়।

সোজা রাস্তায় হেঁটে মূল রাস্তায় যায়। সেখানে একটা স্বস্তা রেস্তোরায় খায়। রেস্তোরার নাম "দি নিউ স্টার রেস্তোরা"।

এরপর শহরে গিয়ে ব্যস্ত রাস্তায় উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটাহাঁটি করে।

এরপর সে একটি সিনেমা হলে প্রবেশ করে। সিনেমা হলের নাম "বলাকা সিনেমা হল"।

প্রায় দুই ঘন্টা পর বের হয়। একটি রেস্টুরেন্টে খাবার খায়। রেস্টুরেন্টের নাম 'আদর্শ হোটেল'।

তারপর সে হেঁটে চলে যায় বিদেশী দোকানের হাটে। সেখানে মিশরীয় দোকানে প্রবেশ করে। দোকানের মালিকের সাথে একটি বই খোলে কীসব আলাপ আলোচনা করে।

সেখানে অনেক সময় কাটিয়ে শেষ বিকেলের দিকে মানিকপীরের টিলা গোরস্থানে এসে দাড়োয়ানের সাথে গল্পগুজব করে।

এরপর কোনও কোনও দিন সে গোরস্থানের ভেতরে শর্টকার্ট রাস্তা ব্যবহার করে অন্যদিকে বের হয়ে ট্যাক্সি

নিয়ে বাড়ি যায়। কোনও দিন শর্টকার্ট রাস্তা ব্যবহার করে না। কোনও দিন মিশরীয় দোকান থেকে বের হবার সময় তার হাতে একটি ব্যাগ থাকে। কোনও দিন থাকে কালো ডায়রীর মত বেশ বড় একটি বই।

কোনও কোনও দিন সে গোরস্থানের গেটের পাশের বাঁধানো অংশে ঘুমিয়ে পড়ে। সেদিন রাতে সে বাড়ি যায় না।

সাইদুর রহমান বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পুরো রিপোর্টটি পড়লেন। তার ধারনা ছিল ফিলোসফারদের কেউ পলোনিয়াসের সাথে যোগাযোগ করবে। কিন্তু ধারনা ভুল প্রমাণিত হল।

সাইদুর রহমান যে অফিসার রিপোর্টটি নিয়ে এসেছিল তাকে বললেন, "কে মূল দায়িত্বে ছিলো?"

অফিসার বলল, "তরুণ পুলিশ অফিসার হাসিবুল হক। ডিভিশন থ্রি নাইন থ্রি।"

সাইদুর রহমান বললেন, "ওকে আসতে বল। আমি কথা বলব।"

হাসিব পাশের রুমেই ছিল। অফিসার তাকে গিয়ে বলার পর সে সাইদুর রহমানের রুমে প্রবেশ করল। এই রুমে এর আগে সে একবার এসেছে। বিশেষ বাহিনীতে ঢোকার আগের ভাইভার সময়।

হাসিব এসে তার আইডি নাম্বার এবং ডিভিশনের নাম বলল।

সাইদুর রহমান বললেন, "বসো।"

হাসিব বসে জিজ্ঞেস করল, 'স্যার, কোথাও কি কোন সমস্যা?'

সাইদুর রহমান রিপোর্ট দেখতে দেখতে বললেন, "না, কোথাও কোন সমস্যা নেই। সেটাই সমস্যা। আমি তো ভেবেছিলাম কোন ক্লু পাওয়া যাবে।"

হাসিব কি বলবে ভেবে পেল না। মোটকথা এই লোকটাকে ফলো করার কাজটা এযাবৎকালে সে যত কাজ করেছে তার মধ্যে সবচেয়ে বিরক্তিকর মনে হয়েছে। সে চুপ করে বসে রইল।

সাইদুর রহমান বললেন, "তোমার এই লোকটি সম্পর্কে কি মনে হয়?"

হাসিব বলল, "আমার মনে হয় লোকটা বেশ অদ্ভুত। তবে লেখকের মৃত্যুর সাথে তার যুক্ত থাকার মত কিছু দেখিনি এই ক'দিনে।"

সাইদুর রহমান তার চশমা ঠিক করতে করতে বললেন, "তাহলে তার হাতের ঐ কালো বইটাকে তুমি কি বলবে? ওটা কি হতে পারে না লেখক আফসার উদ্দিনের হাতে থাকা সেই মায়াদের পুরনো বই?"

হাসিব এভাবে ভাবেনি। কারণ বইটাকে ততোটা পুরনো মনে হয়নি তার কাছে। তাছাড়া এই বই সে বই হলে লোকটা এভাবে জনসমক্ষে তা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে কেন?

হাসিব কিছু বলল না। সে এমন মুখভঙ্গি করল তার মানে দাঁড়ায় "হতে পারে স্যার"।

সাইদুর রহমান বললেন, "আচ্ছা তুমি যাও"।

হাসিব উঠে চলে গেলে তিনি আবার পুরো ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে বসলেন। একে ফলো করে কিছুই হয়নি। এখন জিজ্ঞাসাবাদে নামতে হবে। প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে গোরস্থানের দাড়োয়ানকে। তারপর সেই মিশরীয় দোকানের মালিককে। তারপর যেতে হবে পলোনিয়াসের কাছে। যদিও আফসার উদ্দিন খুনের সাথে পলোনিয়াসের কোন সম্পর্ক এখনো পাওয়া যায়নি। কিন্তু গোরস্থানে তার গমন, কালো ব্যাগ, কালো বই , মিশরীয় দোকানে প্রতিদিন গমন বেশ কৌতুহল উদ্দীপক।

সাইদুর রহমান ঠিক করলেন, পরদিন সন্ধ্যায় যখন পলোনিয়াস তার বাড়িতে থাকবে তখন তিনি নিজেই যাবেন গোরস্থানের দাড়োয়ান এবং মিশরীয় দোকানের মালিককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে। এরপর যাবেন পলোনিয়াসের বাড়িতে। আর এই সময়ে পলোনিয়াসের দিকে সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখবে পুলিশের লোক।

পরদিন সন্ধ্যায় পলোনিয়াস যখন তার ঘরে ছিল তখন সাইদুর রহমান তার বিশেষ বাহিনীর কয়েকজন লোক নিয়ে সরাসরি চলে গেলেন সেই গোরস্থানের গেটে। গোরস্থানের দাড়োয়ান লোকটা বৃদ্ধ। গাল ভাঙ্গা। মুখে

খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সে নিশ্চয়ই পান খায়। তাই তার দাঁতগুলো কালো কালো।

সাইদুর রহমান লোকটার সামনে গিয়ে বললেন, "আপনার নাম কি?"

লোকটি প্রথমে উদাস ভঙ্গিতে তাকাল। তারপর থুঃ করে মাটিতে থুতু ফেলে বলল, "ইদ্রিস। কি দরকার?"

সাইদুর রহমান পলোনিয়াসের একটি স্কেচ পকেট থেকে বের করে লোকটির চোখের সামনে ধরে বললেন, "এই লোকটাকে চেনেন?"

লোকটি কিছুক্ষণ ছবির দিকে তাকিয়ে একটা দেয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে বলল, "জ্বে না। জিন্দেগীতে দেখি নাই।"

সাইদুর রহমান এবার একটু কঠোর হলেন। গলার স্বর রুক্ষ করে বললেন, "আমরা পুলিশের লোক। এই লোকটিকে দেখা গেছে তোমার সাথে কথা বলতে। সুতরাং, অযথা মিথ্যা বলার চেষ্টা করো না।"

দাড়োয়ান লোকটি ভড়কে গেল। সাইদুর রহমান আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছেন। আকস্মিকভাবে চোখ মুখ পালটে গলার স্বর বদলে প্রশ্ন করেছেন। দাড়োয়ান হতাশ ভঙ্গিতে সাইদুর রহমানের দিকে তাকাল। বোঝা গেল এই প্রথম সে বিষয়টাকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং সে যথেষ্ট ভয় পেয়েছে।

সে আমতা আমতা করে বলল, "স্যার। আমি কিছু জানিনা। বিশ্বাস করেন স্যার, আমি কিছু জানিনা। আমারে ছাইড়া দেন।"

সাইদুর রহমান লোকটাকে আশ্বস্ত করে বললেন, ঠিকঠাক জবাব দিলে তোমাকে কিছু করা হবে না। উত্তর দাও, এই লোকটাকে চেন?"

"জ্বে স্যার। চিনি।"

"কীভাবে চেন?"

"কয়েকমাস আগে তার লগে আমার পরিচয়। ভবঘুরে লোক। এখানে আইসা মাঝে মইদ্যে সুখ দুখের আলাপ করেন।"

"গোরস্থানের ভেতরে যায় কেন? তার হাতের কালো ব্যাগে কি থাকে?"

স্যার, উনি অনেক জ্ঞানী লোক। আমি এতদিন এই জায়গাটাতে কাজ করছি। এর প্রতি আমার কোন মায়া-মমতা আছিল না। উনার লগে দেখা হওয়ার পর আমি বুঝতে পারছি গোরস্থানেরও বিশেষত্ব আছে। উনি গোরস্থানে যান মাঝে মাঝে। গিয়া নিরালে বইসা থাকেন। তার কালো ব্যাগে বই থাকে, মূর্তি থাকে।"

"তার সাথে তোমার কি কি কথা হয়?"

"অনেক ধরনের কথা স্যার। সব কি আর মনে থাকে। তবে তিনি খারাপ কিছু কন না।"

"গোরস্থান নিয়ে সে কি বলে?"

"অনেক কথা স্যার। তিনি কন, জেতা মানুষের চেয়ে মরা মানুষ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই গোরস্থান, জেতা মানুষের ভূমি থিকা উত্তম। এইসব কত কিছু।"

"তার কোন আত্মীয় স্বজনের কবর আছে এখানে?"

"আমার জানা নাই স্যার। উনার আত্মীয় স্বজন, ভাই বেরাদর সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। উনি সবার মৃত্যু হইলেই একই অনুভূতি দেখান। আমার সাথে কার কার নতুন কবর হইল, তাদের নামধাম, কি করত ইত্যাদি নিয়া আলাপ করেন। আমি রেজিস্ট্রার বুক দেখে সব বললে তিনি মানবজীবন কতটা অর্থহীন তা একেকটা মৃত্যুরে উদাহরণ হিসেবে নিয়া বুঝাইয়া দেন।"

সাইদুর রহমান লোকটার দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর শেষ প্রশ্ন করলেন, "লোকটাকে তোমার কেমন মনে হয়?"

লোকটা বলল, "উনি ভাল লোক স্যার।"

সাইদুর রহমান দাড়োয়ানের সাথে কথা বলা বন্ধ করলেন। লোকটা এখানের দাড়োয়ান না শুধু। দাড়োয়ান কাম রেজিস্ট্রার। সাইদুর রহমান লোকটির কথায় অবাক হলেন না। কারণ তিনি জানেন পজোনিয়াস দার্শনিকদের দলে ছিল। সে বেশ বুদ্ধিমান। সুতরাং, গোরস্থানের একজন দাড়োয়ানকে কথায় মুগ্ধ করে ফেলা তার কাছে কিছুই না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, সে কৌশলে দাড়োয়ানের কাছ থেকে কে নতুন কবরস্থ হল, তাদের নাম

ধাম ঠিকানা সব জেনে নিচ্ছে! কিন্তু কি উদ্দেশ্যে? এর সাথে কি লেখক আফসার উদ্দিন খুনের কোন সম্পর্ক আছে? না জড়িয়ে আছে অন্য কোন ক্রাইম?

কাকতালীয়ভাবে ঠিক তখনি সাইদুর রহমানের মনে পড়ল এই গোরস্থানেই লেখক আফসার উদ্দিনের কবর হয়েছিল। পত্রিকায় পড়েছিলেন ৭০২ নাম্বার কবর।

সাইদুর রহমানের ইচ্ছা হল তিনি আফসার উদ্দিনের কবরটি দেখবেন। কেন যেন তার মনে হচ্ছিল এতে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে। হয়তো এই কবরের কারণেই পলোনিয়াস এই গোরস্থানে আসছে নিয়মিত।

দারোয়ানের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তিনি গোরস্থানে ঢুকে পড়লেন। বিশাল গোরস্থানে সারি সারি কবর। সোজা রাস্তা একসময় বাঁক খেয়ে দুদিকে সরে গেছে। কিছুদূর পরপর বিরাট সাইজের কিছু বোর্ডে ম্যাপ এবং কবরের নাম্বার লেখা আছে স্পষ্ট করে।

বোর্ড দেখে বা দিকের রাস্তা ধরে এগুলেন সাইদুর রহমান।

৭০২ নাম্বার কবরের সামনে এসে তিনি দেখলেন লেখক আফসার উদ্দিনের নামফলকযুক্ত কবর। সেখানে একটি প্লেটে খোদাই করে লেখা আছে আফসার উদ্দিনের লেখা একটি অনুচ্ছেদ।

"কবরের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। কবর দেখলে সাধারণের মনে একটু ভয় ভীতি, অলৌকিক চিন্তা এসে ভর

করবে এমন। অনেক গুলো কবর একসাথে। যেমন গোরস্থান। দেখলেই মনে হতে হবে এখানে মৃতদের সমারোহ। ব্যস্ত শহরের ততোধিক ব্যস্ত সড়কের পাশে ছন্নছাড়ার মত একা একা কিছু কবর দেখা যায়। এগুলো দেখলে কারো মনে কোন ভাব জাগে না। ভয় জাগে না। আলাদা কোন চিন্তাও জাগে না। ব্যস্ত মানুষের সময়ের অভাবই এর কারণ হয়তো।

কিন্তু আসলে কবর হয়েও এই কবরগুলো ব্যর্থ কবর।"

সাইদুর রহমান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশটা দেখে নিলেন। কবর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঠিক যেমনটি থাকার কথা। কোথাও কোন সমস্যা দেখা গেল না।

সাইদুর রহমান কিছুটা হতাশ হয়ে পেছনের পথ দিয়ে বের হলেন। এসময় তিনি লক্ষ্য করলেন পিছনের গেটটা খুব ছোট এবং তালা লাগানো। কিন্তু খুব পুরনো তালা। একটু জোরে টান দিলেই খুলে যায়।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এখন মিশরীয় দোকানটাতে যেতে হবে। সেখানে গিয়ে কোন লাভ হবে কি না তিনি নিশ্চিত না।

গোরস্থান থেকে বিদেশী দোকানের হাটে পৌছাতে সাইদুর রহমানের দশ মিনিট লাগল। বিদেশী দোকানগুলো উজ্জ্বল আলোতে ঝলমল করছে। সাইদুর রহমান সময় নষ্ট করতে চাইলেন না। তিনি দ্রুত মিশরীয় দোকানটাতে গেলেন। একটা লোক ছিল বসা। মাঝবয়েসী। সে উঠে সালাম দিল।

মিশরীয় লোকটা খুব ভাল বাংলা বলতে পারে না তাই কথাবার্তা হয়েছিল ইংরেজী এবং বাংলা মিশিয়ে। বোঝার সুবিধার্তে এখানে শুধুমাত্র বাংলাতেই লেখা হল।

সাইদুর রহমান পকেট থেকে পলোনিয়াসের স্কেচ বের করে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, "এই লোকটিকে চেন?"

মিশরীয় দোকানের লোকটি মাথা নেড়ে বলল, "জ্বী, চিনি। ইনি আমাদের এখানে প্রায়ই আসেন।"

সাইদুর রহমান বললেন, "আমরা পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে এসেছি। এর সম্পর্কে কিছু তথ্য দরকার আমাদের। আশা করছি আপনি সহযোগীতা করবেন।"

লোকটি বলল, "জ্বি স্যার। অবশ্যই। বসুন স্যার।"

লোকটি পুলিশের কথা শোনে ভয় পেয়েছে। মুখে হাসি ফুটানোর চেষ্টা করলেও ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেছে বোঝা যাচ্ছে।

সাইদুর রহমান একটা চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, " এই লোকটি কবে থেকে আপনাদের এখানে আসে?"

"এই কয়েকমাস হল তিনি নিয়মিত আসেন।"

"লোকটি কেমন?"

"আমি যতটুকু জানি তিনি বেশ ভাল লোক। মিশরের ঐতিহ্যবাহী অনেক জিনিসের মাটির এবং কাঠের প্রতিরূপ তিনি আমাদের কাছ থেকে কিনেছেন।"

"সে এখানে আসে কেন?"

"উনি আসলে প্রাচীন মিশরীয় সংস্কৃতি এবং সভ্যতা নিয়ে খুব আগ্রহী। তিনি সে সম্পর্কে প্রচুর পড়ালেখা করেছেন। অনেক জানেন। কিছুদিন আমাদের এখানে এসে মাটির এবং কাঠের জিনিসপত্র তৈরী করা শিখেছেন। তিনি ব্যবসায়িক কারণে শিখতে চাননি। আমাদের ঐতিহ্যের প্রতি ভালোলাগা থেকেই শিখতে চেয়েছেন। তাই আমরা শিখিয়েছিলাম।"

লোকটি একটি মূর্তি তুলে ধরে বলল, "এই যে শেয়াল দেবতা আনুবিসের মূর্তি, এটা তিনিই বানিয়েছেন। তার চেয়ে ভাল আনুবিসের মূর্তি মাটি দিয়ে কেউ বানাতে পারবে বলে আমার মনে হয় না।"

সাইদুর রহমান দেখলেন মূর্তিটি আসলেই সুন্দর।

সাইদুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন, "আর কি কি সে বানিয়েছে?"

লোকটি আরো কয়েকটি মাটির মূর্তি দেখালো। তার মধ্যে স্ফিংস, মিশরীয় কয়েকজন ফারাওদের মমির মাটির মূর্তি ছিল।

"সে যে একটা কালো ব্যাগ নিয়ে আপনাদের এখানে আসে তাতে কি এসব মূর্তি থাকে?"

"হ্যাঁ। কখনও মাটির মূর্তি, কখনও মাটি। সব ধরনের মাটি দিয়ে এসব মূর্তি হয় না। তিনি আমাদের কাছ থেকে শিখেছেন কিন্তু তার কাজ আমাদের থেকে ভাল। কারণ

তার নিষ্ঠা বেশি। মমি নিয়ে তিনি এতই বেশি জানেন যে একটি বই লিখছেন।"

"মমি নিয়ে বই?"

"জ্বী স্যার। বইটি আমাকে বিভিন্ন সময় দেখিয়ে নিয়ে যান। বইয়ের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন।"

"কি ধরনের বই?"

"মমি তৈরীর বিভিন্ন কৌশল। ঐতিহাসিক সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত। মিশরের মমি, প্রাচীন মায়াদের মমি ইত্যাদি নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা এবং বিভিন্ন সভ্যতায় তৈরী মমিদের পদ্ধতিগত ভিন্নতা। সেখানে তার অনেক মৌলিক চিন্তাভাবনা আছে।"

"প্রাচীন মায়ানরা মমি বানাত নাকি?"

"জ্বী স্যার। আমি মমির দেশের লোক কিন্তু এটা আমিও জানতাম না। বিভিন্ন সভ্যতায় মৃতদেহ সংরক্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। উনার কাছ থেকেই শুনেছি রাজা হেরোড তার ম্যাকাবীয় স্ত্রী মারিয়ামীর মৃতদেহ মধুতে ডুবিয়ে সংরক্ষণ করেছিলেন, তাজমহলের ভেতরে মোগলসম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী মমতাজ মহলকে মমি করে রাখা হয়েছে।"

সাইদুর রহমান বেশ বিভ্রান্ত অনুভব করলেন। তিনি মিশরীয় লোকটির সাথে কথা শেষ করে ছুটলেন

পলোনিয়াসের বাড়ির দিকে। সেখানে বিশেষ বাহিনীর কিছু লোক আগে থেকেই ছিল।

কলিংবেলের শব্দে পলোনিয়াস দরজা খুলে দিল। জিজ্ঞেস করল, "কাকে চাই?"

সাইদুর রহমান স্পষ্ট স্বরে বললেন "আপনাকে।"

পলোনিয়াস এবার ভালো করে সাইদুর রহমানের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি তো পুলিশের লোক। সাইদুর রহমান?"

"চিনতে পেরেছেন তাহলে।"

"পেরেছি। তবে আপনার আগমনের কারণ বুঝতে পারলাম না। আপনি নিশ্চয়ই জানেন ওদের সাথে আমার কোন সংশ্লিষ্টতা নেই।"

"আমি শুনেছি।"

"তাই যাচাই করতে এসেছেন?"

"অনেকটা সেরকমই। একটা খুনের ব্যাপারেও কথা বলব। দরজার বাইরেই কি শুরু করব না ভেতরে আসতে দিবেন?"

"আসুন, আসুন।"

সাইদুর রহমান পলোনিয়াসের বসার ঘরে প্রবেশ করলেন। ছিমছাম সাজানো কক্ষ। বাতাসে একধরনের সুগন্ধ।

পলোনিয়াস একটা চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করল, "কোন খুন?"

সাইদুর রহমান বললেন, "লেখক আফসার উদ্দিন খুন। ভদ্রলোকের সাথে আপনার জানাশোনা ছিল।"

পলোনিয়াস গম্ভীরভাবে বলল, " আর তাই আপনি আমার পিছনে লোক লাগিয়েছেন? নিশ্চয়ই ঐ দার্শনিক উন্মাদদের কথায়। দার্শনিক ভাঁওতা দিয়ে সারা শহরে ক্রাইম করে বেড়াচ্ছে। তাছাড়া আফসার উদ্দিন লেখক সাহেব তো সুইসাইড করেছিলেন। তিনি আবার খুন হলেন কবে?"

সাইদুর রহমান বললেন, " আমরা আশংকা করছি খুন। আর আপনার ধারণা ঠিক না। কারো কথায় আপনার পিছনে লোক লাগানোর মানুষ আমি নই। আমাদের নিজস্ব গোয়েন্দা বিভাগ আছে। তার শক্তি এবং ক্ষমতা সম্পর্কে আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন।"

পলোনিয়াস তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল।

তারপর বলল, "ওদের সম্পর্কে আপনি যা জানেন আমি তাই জানি। হয়তো অনেক কমও হতে পারে। কারণ অনেকদিন ওদের সাথে আমার যোগাযোগ নেই। ওদের সন্ত্রাসী সংগঠনের কাঠামো এমন যে, কেউ একজন বের হয়ে গেলেও তেমন বড় কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"

সাইদুর রহমান বললেন, "তা আমি জানি। তাই ওদের সম্পর্কে জানতে আপনার কাছে আসিনি। এসেছি আফসার উদ্দিনের খুন নিয়ে কথা বলতে।"

পলোনিয়াস বলল, "লোকটাকে আমি চিনতাম। কয়েকবার কথা হয়েছে। এর বেশি কিছু না।"

"উনার কাছে প্রাচীন মায়াদের লেখা একটি বহু পুরনো বই ছিল, তা কি আপনি জানতেন?"

"অবশ্যই না। জানতাম না।"

"আমার ধারণা জানতেন। এই কারণেই আপনি তার সাথে কথা বলেছিলেন। কারণ ছাড়া আপনি কারো সাথে খোশগল্প করবেন এ আমার বিশ্বাস হয় না।"

"আপনার বিশ্বাস না হলে তা একান্তই আপনার সমস্যা। আমি কিন্তু সত্যিই বইটির ব্যাপারে কিছু জানতাম না। তার মৃত্যুর পরে জেনেছি।"

"আপনার তো প্রাচীন সভ্যতা নিয়ে অনেক আগ্রহ। প্রাচীন মিশরের সভ্যতা নিয়ে পড়াশোনা করেছেন অনেক। সেখানেও মমি ছিল, পিরামিড ছিল। মায়াদেরও পিরামিড ছিল। এছাড়া শুনলাম আপনি নাকি মমি নিয়ে বই লিখছেন?"

"আমার ব্যাপারে বেশ গবেষণা করে এসেছেন দেখছি। অবশ্য আজ সকালে যখন আপনার বাহিনীর দুটি লোককে দেখলাম আমার বাড়ির ঝোপের পাশে ঘাঁপটি মেরে বসে আছে তখনি কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলাম। আচ্ছা, তা যাইহোক, মমি নিয়ে যা বলছিলেন, হ্যাঁ, একটা বই লিখছি। সহজে মমি তৈরীর কৌশল। তাই প্রচুর পড়াশোনা ও গবেষণা করতে হচ্ছে। আমি খুব ব্যস্ত।"

পলোনিয়াস পাশের রুমে উঠে গিয়ে বইয়ের পান্ডুলিপি নিয়ে এল। বিভিন্নভাবে মমি তৈরীর কৌশল চিত্রসহ্ লেখা আছে বইয়ে। অনেক ক্ষেত্রে দেশীয় কিছু লতা পাতার রস মৃতদেহে মাখিয়ে রাখার অদ্ভুত পদ্ধতিরও উল্লেখ আছে। পলোনিয়াস সাইদুর রহমানকে পুরো বইটি দেখাল। সাথে মমি নিয়ে বলল অনেক কিছু।

কথা শোনে সাইদুর রহমানের সন্দেহজনক কিছু মনে হল না। আসলে বই দেখে তিনি অবাক এবং মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। এত বড় এবং অসামান্য কাজ করা সহজ কথা না।

তিনি এক পর্যায়ে পলোনিয়াসকে বিদায় জানিয়ে ঘর থেকে বের হলেন। হাঁটতে হাঁটতে গাড়ির কাছে পৌঁছার পর সাইদুর রহমান হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। বইয়ের একটা চিত্র তার চোখে ভেসে উঠল এবং তৎক্ষনাৎ তার মাথায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। তিনি দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রায় দৌড়ে আবার পলোনিয়াসের দরজার সামনে গিয়ে কলিংবেল চাপলেন। তার পিছু পিছু গেল বিশেষ বাহিনীর ছয়জন সদস্য।

প্রায় মিনিট খানেক পর পলোনিয়াস দরজা একটু খুলে মুখ বের করে বলল, "আবার কি? আরো কিছু জিজ্ঞেস করবেন?"

সাইদুর রহমান গলার স্বর গাঢ় করে বললেন, "কিছু মনে করবেন না। আপনার বাড়ি সার্চ করা হবে।"

পলোনিয়াস গম্ভীর হয়ে একবার মাটির দিকে তাকাল। তারপর ক্ষীপ্রগতিতে তার হাত সামনে আনল। সে হাতে রিভলভার। মুহূর্তের মধ্যে সে রিভলভারের ট্রীগার চেপে ধরল। সাইদুর রহমানের ভাগ্য ভাল যে তিনি সরে যেতে পেরেছিলেন। কিন্তু তার ঠিক পিছনে দাঁড়ানো এক সদস্যের ডানহাতে লাগল গুলি। সে প্রায় ছিটকে পড়ে গেল বিশ্রী এক আর্তনাদ করে।

ধাতস্ত হয়ে সাইদুর রহমান পলোনিয়াসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পলোনিয়াসের হাতে তখনো রিভলভার ছিল। সাইদুর রহমান রিভলভার কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করছিলেন। তখন পলোনিয়াস আবার রিভলভারের ট্রীগার চেপে দিল। এবার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক তরুণ পুলিশ অফিসারের চোখের নিচ দিয়ে ধাতব গুলি প্রবেশ করে খুলি দিয়ে বেরিয়ে গেছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটল কয়েকমিনিটের মধ্যেই।

এতক্ষণে বিশেষ বাহিনীর অন্য সদস্যরা এসে পলোনিয়াসকে নিরস্ত্র করে হাতকড়া পড়াল। সাইদুর রহমান ঘাবড়ে গেলেন। মেঝেতে পুলিশ সদস্যাটির লাশ এক চোখ খোলা অবস্থায় পড়ে আছে।

তিনি ড্রয়িং রুমের পাশের কক্ষে গেলেন পিস্তল উঁচিয়ে। সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা ধরনের মাটির এবং কাঠের পুতুল।

রুমের এককোনে শেয়াল দেবতা আনুবিসের বিরাট এক মূর্তি।

প্রাচীন মিশরীয়রা বিশ্বাস করত শেয়ালের ভেতর বাস করে পবিত্র আত্মা। শেয়াল দেবতা আনুবিসের শরীর মানুষের মতো কিন্তু তার মুখ শেয়ালের। আনুবিস ছিলেন তাদের মৃত্যু, সমাধি ও মমির দেবতা। এছাড়া প্রাচীন মিশরীয়রা মনে করত মৃতকে অনন্ত শূন্যতাময় মৃতদের পৃথিবীতে প্রবেশাধিকার দেয়। তাদের বিশ্বাস ছিল প্রথম মমি তৈরী করেন শেয়াল দেবতা আনুবিস।

আনুবিসের পিতা দেবতা ওসিরিসকে হত্যা করেছিল তার ভাই সেথ। সে মৃতদেহকে চৌদ্দ টুকরা করে সমস্ত মিশরে ছড়িয়ে দেয়। অসিরিসের স্ত্রী আইসিস মৃতদেহের খণ্ডগুলো সংগ্রহ করেন। একপর্যায়ে আনুবিস পিতা ওসিরিসের মৃতদেহ মমি করে সংরক্ষণ করেন। সেটাই ছিল প্রাচীন মিশরের প্রথম মমি। আর সেই থেকে আনুবিস হয়ে গেলেন মৃতদেহ, সমাধি ও মমির দেবতা।

সাইদুর রহমান কিছুক্ষণ ভ্রু কুঁচকে শেয়ালের মাথাওয়ালা মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর পাশের রুমে প্রবেশ করলেন। সেখানে গিয়ে নিচে তাকাতেই তার রক্ত হিম হয়ে গেল। তার পিছু পিছু প্রবেশ করেছিল কয়েকজন তরুণ অফিসার। তারাও একরকম বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

পুরো রান্নাঘরের মেঝে জুড়ে ছড়িয়ে আছে ছোট ছোট অনেক মমি। মুখগুলো জীবন্ত যেন। দেখলেই বোঝা যায় এগুলো মাটি দিয়ে তৈরী মমির পুতুল না। সত্যিকারের

মৃতদেহ দিয়ে বানানো মমি। মুখগুলোকে কোন রাসায়নিক পদার্থ বা ভেষজ রস দিয়ে জীবন্ত করে রাখা হয়েছে। সবকটি মমিই ছোট ছোট বাচ্চাদের। বয়স দশ বারোর ভেতরে হবে।

একপাশে কাঠের একটি টেবিলের মত জায়গায় রাখা আছে সাদা কাপড়ে জড়ানো এক বাচ্চার মৃতদেহ। সম্ভবত একে আজ মমি করা হতো। চুলায় অল্প আগুনের উপর একটি ফ্রাইং প্যানে কালো তরলের মিশ্রণ গরম করা হচ্ছে।

সাইদুর রহমানের কাছে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। কেন পলোনিয়াস গোরস্থানে যায় এবং কেন যায় মিশরীয় দোকানে মমি নিয়ে আলাপ করতে। ছোট ছোট বাচ্চাদের মৃতদেহ নিয়ে মমির পুতুল বানিয়ে রাখে এই সাইকোপ্যাথ।

পলোনিয়াসকে শক্ত করে চেয়ারের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে।

একজন অফিসার সাইদুর রহমানকে জিজ্ঞেস করল, এখন কি করব স্যার?"

সাইদুর রহমান মাথা ঠান্ডা রেখে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, "সাংবাদিকদের খবর দাও। তারপর এই মমি গুলো কবরস্থ করতে হবে।"

কয়েকটি বড় সংবাদসংস্থার কয়েকজন বড় সাংবাদিককে ফোন দেয়া হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল মিনিট

দশেকের মধ্যে ক্যামেরা ট্যামেরা নিয়ে এক দল সংবাদকর্মী ছুটে এসেছেন।

সাইদুর রহমান সাংবাদিকদের ডেকে এনেছেন তার একটি কারণ আছে। তিনি যখন বিশেষ ক্ষমতা আইনের একটি ধারা ব্যবহার করে আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আরো দৃঢ় হওয়ার জন্য বিশেষ বাহিনী গঠন করেন তখন মিডিয়া বিরোধীতা করেছিল। অনেক বুদ্ধিজীবি মানবাধিকারের দোহাই দিয়ে কঠিন কিছু কলামও লিখেছিলেন। সুতরাং, এই বাহিনীর যেকোন ধরনের সাফল্য নিয়ে মিডিয়াকে জানিয়ে রাখেন।

সাংবাদিকেরা বাড়ির সামনে জড়ো হলে সাইদুর রহমান গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "আপনারা এসেছেন এজন্য ধন্যবাদ। এখানে একটি মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে। আইন শৃঙ্খলার কিছু ব্যাপার মাথায় রেখে আপনাদের সবাইকে বলা হচ্ছে, নিজেদের ক্যামেরা এবং মোবাইল ফোন বাইরে রেখে ভিতরে প্রবেশ করতে। ভিতরে কেউ কোন ছবি তুলতে পারবেন না। ছবি আপনাদের সরবরাহ করা হবে।"

একজন সিনিয়র সাংবাদিক বেশ ভাবিক্কি চালে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন? আমরা সংবাদকর্মী। সত্য পরিবেশন আমাদের কাজ। আপনাদের দেয়া তথ্য আমরা মেনে নেব কেন?"

সাইদুর রহমান ঠান্ডা স্বরে বললেন, "আপনাদের কোন তথ্য দেয়া হয়নি। আপনারা নিজেরা যা দেখবেন তাই

লিখবেন। কিন্তু একটি বিশেষ নাগরিকস্বার্থে আপনাদের কোন ছবি তুলতে বা ভিডিও করতে দেয়া হবে না।"

সাংবাদিকেরা রাজি হলেন। সবাই বুঝতে পারছিলেন ভিতরে মারাত্মক কিছু একটা ঘটেছে। সবাই ক্যামেরা ফোন জমা দিলেন দুজন বিশেষ বাহিনীর সদস্যের কাছে।

একজন তরুণ সাংবাদিক জিজ্ঞেস করল, "এখানে আসলে কি হয়েছে?"

সাইদুর রহমান বললেন, " এক সাইকোপ্যাথ গোরস্থান থেকে শিশুদের মৃতদেহ এনে মমি করে রাখত। কয়েকদিন ফলো করে আমরা আজ একে ধরতে পেরেছি। আমাদের একজন সদস্য নিহত এবং একজন আহত হয়েছে।"

সাংবাদিকেরা ভিতরে প্রবেশ করে চেয়ারে বাঁধা পলোনিয়াসকে দেখলেন। তারপর রান্নাঘরে গিয়ে দেখলেন শিশুদের মমিগুলোকে। ভয়ানক দৃশ্যে সবাই প্রায় নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। ড্রয়িং রুমের একপাশে পড়েছিল বিশেষ বাহিনীর সদস্যের লাশ। একে নিয়ে গাড়িতে তোলা হল।

পলোনিয়াসের হাতে হাতকড়া এবং পিছমোড়া করে চেয়ারের সাথে বাঁধা ছিল। সাইদুর রহমান ছিলেন সাংবাদিকদের সাথে রান্নাঘরে মমিগুলোর সামনে। বিশেষ বাহিনীর একজন সদস্য সাইদুর রহমানের নির্দেশে সাংবাদিকদের সামনেই মমিগুলোর ছবি তুললো। সাইদুর রহমান বললেন, "ছবিগুলোতে মমিদের মুখ ঝাপসা করে আপনাদের দেয়া হবে। কারণ মুখগুলো এতই জীবন্ত যে

চিনতে পারা যাচ্ছে। সুতরাং এদের পিতামাতারা পত্রিকায় তাদের প্রিয়তম সন্তানের লাশের এমন পরিণতি দেখলে তাদের কষ্ট আরো বাড়ত। তাই আপনাদের সরাসরি ছবি তুলতে দেয়া হয়নি।"

সাইদুর রহমান যখন অন্যরুমে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলছেন তখন এক অনুসন্ধানী সাংবাদিক চলে এসেছিলেন পলোনিয়াসের কাছে। পলোনিয়াসের কাছে হাসিবকে রেখে গিয়েছিলেন সাইদুর রহমান। তার কাজ ছিল যেন কোন সাংবাদিক পলোনিয়াসের সাথে কথা বলতে না পারে। কিন্তু হাসিব ইচ্ছে করেই যেন একটু দূরে সরে গিয়ে সাংবাদিককে সুযোগ করে দিল। কারণ তার লক্ষ্যে পৌছানোর সময় প্রায় চলে আসছে। একজন বিশেষ বাহিনীতে বিশৃঙ্খলা দরকার। সাইদুর রহমানের উপর চাপ বাড়ানো দরকার। তাহলে হাসিবের কাজ করতে সুবিধা হবে। এছাড়া পলোনিয়াস লোকটির ব্যাপারেও তার আগ্রহ ছিল।

সাংবাদিক ও পলোনিয়াসের কথোপকথন শুরু হল।

"আপনার নাম কি?"

"পলোনিয়াস।"

"এটা কেমন নাম! আসল নাম কি?"

"পলিয়ার অহিদ"

"আপনি কি করেন?"

"কিছু না।"

"পেশা কি?"

"পেশা নাই।"

আগে কি করতেন?

"আগে দার্শনিকদের ক্লাবে যুক্ত ছিলাম। এর আগে কিছুই ছিলাম না।"

"দার্শনিকদের ক্লাব মানে?"

"একটি গোপন সংগঠন। যা এই শহরের সব ক্রাইম নিয়ন্ত্রণ করে। আপনাদের পুলিশের প্রধান জানেন এসব। কিন্তু মিডিয়া বা সাধারণ মানুষের কাছে গোপন রাখা হয়।"

"আপনি এদের সাথে যুক্ত? এরা মানুষের মৃতদেহ নিয়ে মমি বানায়? বিদেশে পাচার করে?"

সাইদুর রহমান তখন রুমে প্রবেশ করলেন। তিনি শুনতে পেলেন, পলোনিয়াস ধূর্ত হাসি দিয়ে বলছে, "সব আপনাদের পুলিশ জানে।"

পলোনিয়াসের সামনে থেকে সাংবাদিকদের সরিয়ে দেয়া হল। কিন্তু সাইদুর রহমান বুঝতে পারলেন ততক্ষণে অনেক দেরী হয়েছে। এই সাংবাদিক কথাবার্তা রেকর্ড করেছে। তাছাড়া আরো কয়েকজন শেষে এসে যুক্ত হয়েছিল।

সাইদুর রহমান এমন একটা আশংকায় হাসিবকে এখানে রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু সে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি দেখে বিস্মিত হলেন। কিন্তু তিনি আসলে

জানতেন না হাসিব পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের কোন চেষ্টাই করেনি।

সাইদুর রহমানকে সাংবাদিকেরা ঘিরে ধরলো, "দার্শনিকদের ক্লাব মানে কি? এরা কারা?"

সাইদুর রহমান বললেন, "দেখুন এই লোকটা বদ্ধ উন্মাদ। তার নিজের আলাদা পৃথিবী আছে চিন্তার। একে বিশ্বাস করার কিছু নেই। বিশ্বাস না হলে, আমরা একে থানায় নিয়ে যখন বড় ডাক্তারদের দ্বারা মানসিক কিছু টেস্ট করব, তখন রিপোর্ট সংগ্রহ করতে পারেন।"

কিন্তু সাংবাদিকদের বোঝাতে বিশেষ বেগ পেতে হচ্ছিল। একের পর এক প্রশ্ন আসছে। একজন প্রশ্ন করে বসল, "আপনি কি কিছু লুকাতে চাইছেন?"

সাইদুর রহমান হতাশ ভঙ্গিতে তাকালেন। পলোনিয়াসকে গাড়িতে তোলা হয়েছে। সে গাড়ির জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে। সাইদুর রহমানের চোখ পড়ল তার দিকে। সে অল্প অল্প হাসছে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নবাণ বন্ধ হল না।

একজন জিজ্ঞেস করল, "এই লোকটা যেহেতু উন্মাদ একে আপনারা কী করবেন? এর সাথে সত্যিই কি গোপন কোন সংগঠনের সম্পৃক্ততা আছে?"

সাইদুর রহমান বললেন, "একে প্রথমে থানায় নেয়া হবে। যেহেতু এটি গুরুতর বিষয় তাই উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ করা হবে। অপরাধ প্রমাণের

জন্য এর মানসিক পরীক্ষাও দরকার। মানসিক চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করানো হবে। এরপর সম্ভবত এর মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে কোন মানসিক হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হবে।"

অপরাধীর অপরাধ প্রমাণের একটাসরিয়া অর্থাৎ কাজ, ধরণ, প্রকৃতি, অবস্থা এবং ম্যান্সরিয়া বা সেই কার্য সম্পাদনে সায়দানকারী মন দুটোই প্রয়োজনীয়। সুতরাং, কেন ডাক্তার দেখানো হবে এই প্রশ্নটা আর কোন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করল না।

মমিগুলো এবং পলোনিয়াসকে গাড়িতে নিয়ে পুলিশের বিশেষ বাহিনীর একটি দল চলে গেল।

সাইদুর রহমান যখন গাড়িতে উঠতে যাবেন তখন এক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলো, " মমিগুলোর কি হবে?"

সাইদুর রহমান জবাব দিলেন, "এগুলো আজ রাতেই কবর দেয়া হবে।"

সাইদুর রহমান গাড়িতে উঠলেন। গাড়ি চলতে শুরু করল। তিনি জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন অসংখ্য সংবাদকর্মী বাড়িটির সামনে এখনো দাঁড়িয়ে। কয়েকটি টিভি চ্যানেলের গাড়িও চলে এসেছে ইতিমধ্যে।

সাইদুর রহমান কি মনে করে টিভিটা অন করলেন।

"ভয়ংকর এক সাইকোপ্যাথ আটক" নিউজ ব্রেকিং হিসেবে দেখাচ্ছে। সাইদুর রহমান কিছুটা স্বস্তি অনুভব

করলেন। কিন্তু শীঘ্রই কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে। দেরী হয়ে গেল সমস্যা হবে। খুব বড় ধরনের সমস্যা।

থানায় পৌঁছেই সাইদুর রহমান মৃতদেহের মমিগুলো কবর দেয়ার জন্য পাঠালেন। কয়েকটি ফোন করলেন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের। তারা যোগাযোগ করলেন দেশের প্রধান পাঁচটি পত্রিকার সম্পাদকদের। সংবাদ সংস্থার প্রধান কয়েকজনকেও ডাকা হয়েছে জরুরী ভিত্তিতে। এরাই দেশের মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করেন। মিডিয়া এদের আবার একটা চমৎকার নাম দিয়েছে "মিডিয়া মোগল"।

খুব জরুরী ভিত্তিতেই ডাকা হয়েছিল। তাই প্রায় আধঘন্টার মধ্যেই সবাই এসে উপস্থিত হলেন। এরকম আরো অনেকবার হয়েছে। সুতরাং সম্পাদক এবং সংবাদ সংস্থার প্রধানেরা বেশ স্বাভাবিক ছিলেন।

রুদ্ধদার বৈঠক শুরু হল। কয়েকজন বড় কর্মকর্তা সামান্য কিছু আনুষ্ঠানিক কথা বললেন খুব দ্রুত। সবার সামনে চা সরবরাহ করা হয়েছিল।

সাইদুর রহমান গম্ভীর গলায় বললেন, "আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আজ আমাদের বিশেষ বাহিনী এক ভয়ানক সাইকোপ্যাথকে ধরতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের একজন সদস্য নিহত হয়েছেন, একজন হয়েছেন আহত। যদিও বিভিন্ন সময়ে আপনারা আমাদের এই বিশেষ বাহিনীর বিরুদ্ধে মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ করে থাকেন।"

সাইদুর রহমান সবার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বলা শুরু করলেন, "মিডিয়া হয়তো আমাদের কৃতিত্ব দেবে না। তারা কন্সপিরেসি খোঁজবে। সাইকোপ্যাথটা ভয়ানক ধূর্ত। সে কি এক গোপন সংগঠনের নাম করে আজগুবী গল্প করেছে। আমার ধারনা এতেই সাংবাদিকেরা তাদের কল্পনাশক্তি ব্যবহার করে এক অসামান্য কাহিনী তৈরী করতে ফেলতে পারবেন। সুতরাং, যেহেতু রসদ তারা পেয়ে গেছেন তাই গোপন সংগঠন নিয়ে এক দুধর্ষ খবর ছেঁপে বসলে আমি আশ্চর্য হব না। কিন্তু তাতে আমাদের বড় ধরনের ক্ষতি হবে। আমরা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছি। এরা পরিস্থিতি ঘোলাটে করতে তখন ঐ গোপন সংগঠনের নাম ব্যবহার করবে। জনমনে তৈরী হবে আতংক। তাই দেশ ও জাতির স্বার্থে আমি আপনাদের অনুরোধ করছি এই অমূলক কল্পকাহিনী ফিল্টার করার জন্য।"

দৈনিক সত্যান্বেষী পত্রিকার বয়স্ক সম্পাদক হারিছ মুহাম্মদ আসাদ তার পাকা দাঁড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, "ঘটনা যা বললেন তাতে মনে হচ্ছে ফিল্টার করা যাবে। কিন্তু ঐ মানবাধিকার নিয়ে যে খোঁচাটা দিলেন তা হজম করতে পারলাম না। মিডিয়া হচ্ছে জাতির বিবেক। আমাদের তো সবদিকেই খেয়াল রাখতে হয়। আর বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না।"

সাইদুর রহমান বললেন, "আজকে আমাদের একজন তরুণ সদস্য বিচার বহির্ভূত ভাবে খুন হয়েছে। আশা করি তার ব্যাপারেও আপনাদের সহানুভূতি থাকবে।"

ডেইলি আর্থ পত্রিকার এডিটর মাহফুজ চৌধুরী বললেন, "অবশ্যই, অবশ্যই। গণমাধ্যম, পত্রিকা, মিডিয়া এগুলো হচ্ছে ফ্রিডম অব স্পিচ চর্চার জায়গা...

আলোচনা আরো কিছুক্ষণ চলল। এই সময়ে সম্পাদকেরা ফ্রিডম অব স্পিচ, গণমাধ্যমের ভূমিকা ইত্যাদি নিয়ে বিস্তর কথাবার্তা বললেন। পুরোটা সময় সাইদুর রহমান বিরক্তমুখে বসেছিলেন। কারণ তার কথা বলা শেষ। যদিও তিনি "অনুরোধ" করেছেন, কিন্তু তিনি জানেন এটা বাস্তবায়িত হবেই। কাল আর গোপন সংগঠন জাতীয় নিউজ বড় কোন পত্রিকায় আসবে না। নিম্নমানের ট্যাবলয়েড জাতীয় পত্রিকায় আসতে পারে। তবে সেসবে কোন সমস্যা হবে না।

কখনও কখনও দেশের স্বার্থে কিছু নিউজ ফিল্টার করতে হয়। সাইদুর রহমান জানেন এরা যতই ফ্রিডম অব স্পিচের কথা বলুক না কেন অনেকের স্বার্থেই এরা নিউজ ফিল্টার করে বা প্রোপাগান্ডা চালায়। সারা পৃথিবীতেই এমনটা হয়। ১৯৫৫ সালে আমেরিকা ভিয়েতনামে অন্যায় আগ্রাসন শুরু করে এবং যুদ্ধ শেষ হয় ১৯৭৫ সালে। এতে নিহত হয় তিন মিলিয়ন ভিয়েতনামী, তিন লাখ হয় নিখোঁজ, আহত হয় ৪ দশমিক চার মিলিয়ন এবং বিষাক্ত

রাসায়নিকে আক্রান্ত হয় দুই মিলিয়ন ভিয়েতনামের লোক। এই যুদ্ধকে আমেরিকান মিডিয়া সমর্থন দিয়েছিল। উপসাগরীয় যুদ্ধে আমেরিকান টিভি চ্যানেল সিএনএন এবং ফক্স নিউজ এমনভাবে যুদ্ধের সংবাদ পরিবেশন করেছিল যে জনগণের মনস্তত্ত্ব চলে যায় যুদ্ধের দিকে। এরা যুদ্ধের যৌক্তিকতার বীজ মানুষের মনে বপন করে দেয়। ১৯90 এর মধ্যভাগ থেকে পেন্টাগণও স্বীকার করতে বাধ্য হয় এই "সিএনএন এফেক্ট" এর কথা। প্রপাগান্ডা বা মিথ্যা তথ্য সাধারণ মানুষের মগজে ঢুকিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্র তাদের নিজস্ব স্বার্থ হাসিল করে। আমেরিকার ২০০৩ সালে ইরাক আগ্রাসনের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটেছে। মানববিধ্বংসী অস্ত্র রয়েছে এই অজুহাতে যখন ইরাকে হামলা করা হয় তখন ফক্স নিউজ সহ অন্যান্য আমেরিকান মিডিয়া এমনভাবে প্রোপাগান্ডা চালায় যে জনমনে এইবিশ্বাস দৃঢ় হয় যে ইরাকে পারমানবিক অস্ত্র আছে। তারা "শোডাউন উইথ সাদ্দাম" "কাউন্ট ডাউন ইরাক" ইত্যাদি নাম দিয়েছিল সংবাদের। পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিক রন সাসকিন্ড রিপোর্ট করেন, মুসলিম সন্ত্রাসীদের সাথে ইরাক জড়িত এমন একটি জাল ডকুমেন্ট তৈরী করে সিআইএ যুদ্ধের ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য। বুশ প্রসাশনের কাছে তখন গোয়েন্দা সূত্রে তথ্য ছিল যে ইরাকে কোন মানববিধ্বংসী অস্ত্র নেই।"

কিন্তু তবুও তারা প্রোপাগান্ডা চালায়। তাদের হয়ে মূলত কাজটা করে মিডিয়া। ইরাকে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষ মারা যায়। তারপর ২০০৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর স্বয়ং বুশ সাহেব স্বীকার করেন, নয় এগারোর হামলার সাথে ইরাকের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ তাদের কাছে ছিল না।

এসব কীভাবে কাজ করে তা দেখাতে বিশ্বখ্যাত বুদ্ধিজীবি নোয়াম চমস্কি, এডওয়ার্ড হারমানের সাথে মিলে সামনে এনেছিলেন তার প্রোপাগান্ডা মডেলের ধারনা।

মূলকথা হল, তথ্য প্রকাশের আগে ফিল্টারিং প্রসেসের মধ্য দিয়ে যায়। ক্যাপিটালিস্ট মিডিয়ায় জনগণ বা সাধারণ মানুষ মিডিয়ার মাধ্যমে সঠিকভাবে জানতে পারবে না সত্যিকার অর্থে কি ঘটছে, কেন ঘটছে।

যাইহোক, মিটিং শেষ হলে পলোনিয়াসকে দেখলেন একজন বড় মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ। তিনি বললেন, "এই লোকটির অবস্থা খুব খারাপ। যেকোন সময় হিংস্র আচরণ শুরু করতে পারে।"

অসুস্থ পলোনিয়াসের চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হল শহরের সবচেয়ে বড় এবং অত্যাধুনিক "চৌধুরী মেমোরিয়াল মানসিক রোগ হাসপাতালে"।

পরদিন সাইদুর রহমান একটি ট্যাবলয়েড পত্রিকায় প্রকাশিত "শহরে সক্রেটিস বিভীষিকা" নামক রিপোর্ট পড়ছিলেন। যদিও মূল পত্রিকা এবং টিভিগুলোতে

ফিল্টারিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু ট্যাবলয়েডগুলোর মনগড়া কাহিনী লেখা বন্ধ করা যায়নি। রিপোর্টটি বেশ সুন্দরভাবে লেখা হয়েছে কল্পণার আশ্রয় নিয়ে। যেখানে এক গুপ্ত সংগঠন বানানো হয়েছে যারা ভয়ংকর সিরিয়াল কিলার। সক্রেটিস লোকটি দেখতে এমনিতেই সুন্দর ছিলেন না। তার চেহারা বর্ননা করতে অনেক ঐতিহাসিক "কুৎসিত" বিশেষণ জুড়ে দেন। পত্রিকাটি সেই সক্রেটিসের ছবিকে এঁকেছে ভ্যাম্পায়ারের মত দুদিকে দাঁত বের করে। মুখের দুই কোন দিয়ে রক্ত ঝরছে। সাইদুর রহমান ছবিটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন এমন সময় লেখক আফসার উদ্দিনের স্ত্রী বললেন, "আসতে পারি?"

সাইদুর রহমান মুখ তুলে বললেন, "আসুন।"

আফসার উদ্দিনের স্ত্রী এসেছেন সাইদুর রহমানের সাথে কথা বলতে। তিনি বেশ কিছু কথা বললেন লেখক আফসার উদ্দিনের ব্যাপারে। এক পর্যায়ে বললেন, "উনার প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিকদের নিয়ে দূর্বলতা ছিলো। তার শোবার ঘরে সক্রেটিস এবং প্লেটোর মুখের মূর্তি ছিল। পাথর দিয়ে বানানো।"

সাইদুর রহমান একধরনের বিভ্রান্তিতে পড়ে গেলেন। মনে হচ্ছে পলোনিয়াস লেখকের খুনের সাথে যুক্ত নয়। তাহলে কে খুনটা করল? বইটা গেল কোথায়? সন্দেহের প্রধান অংশ জুড়ে যদিও রয়েছে দার্শনিকেরা। তবুও অন্য সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

সাইদুর রহমান দার্শনিকদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোন উত্তর পেলেন না। তখন কেন যেন তার সন্দেহ আরেকটু গাঢ় হল। তার মনে হচ্ছিল পলোনিয়াসকে ধরে তিনি তাদের কোন বড় জায়গায় হাত দিয়ে ফেলেছেন। এখন পলোনিয়াসকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে অনেক কিছু বেরিয়ে আসতে পারে। আফসার উদ্দিন খুনের ব্যাপারে বা অন্য কোন বিষয়ে। কিন্তু তার আগে তার কিছু মানসিক চিকিৎসা দরকার।

প্রতিটি তদন্ত কাজ খুব সাবধানে করতে হয়। তাড়াহুড়া করলেই সমস্যা। প্রতিটি ঘটনার বৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বারবার দেখতে হয়। তাহলেই খুব সহজ একটা সূত্র নিমিষেই ধরা দেয়।

সাইদুর রহমান তাই লেখক আফসার উদ্দিনের ফাইলটি নিয়ে তার ব্যাপারে পড়ছিলেন। এ ফাইলটি তিনি আগে দু'বার পড়েছেন। কিন্তু আজ একটা জায়গায় এসে তিনি থমকে গেলেন। একজায়গায় লেখা আছে "লেখক দুবার মানসিক চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ছিলেন।"

সাইদুর রহমান এই লাইনটার নিচে লাল কালিতে দাগ দিলেন। এরপর তিনি মনস্থ করলেন লেখকের মা কিংবা বাবার সাথে কথা বলবেন। এই ব্যাপারে কিছু তথ্য দরকার।

সেদিন বিকেলে লেখকের বাবার বাসায় গেলেন সাইদুর রহমান। লেখকের বাবা আর মা তার এক ছোট ভাইয়ের সাথে থাকেন।

লেখক বাবার নাম সাইফুদ্দিন আহমেদ। তিনি একজন বৃদ্ধ লোক। চোখ দুটি ঘোলাটে। সাইদুর রহমানকে বললেন, "আমার ছেলের আত্মহত্যাকে কি আপনার খুন বলে মনে হয়?"

সাইদুর রহমান বললেন, "আমি সেরকমই মনে করছি। আপনাকে নিশ্চয়ই বলা হয়েছে আমি এসেছি আপনার ছেলের ব্যাপারে কিছু তথ্যের জন্য। এই তথ্যগুলো জানতে পারলে আমাদের সুবিধা হবে।"

ভদ্রলোক তার মোটাকাচের চশমা পাঞ্জাবীর হাতায় পরিষ্কার করতে করতে বললেন, "কি জানতে চান, বলুন।"

সাইদুর রহমান বললেন, "উনার ফাইলে দেখেছি তিনি দু'বার মানসিক হাসপাতালে ছিলেন। এই দু'বার কি ধরনের পরিস্থিতি হয়েছিল বা তিনি কেন হাসপাতালে ছিলেন, একটু বলুন।"

ভদ্রলোক বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, "প্রথমবার অনেক আগের ঘটনা। তখন সে খুব ছোট। কলেজে পড়ে। আমাদের গ্রামের বাড়িতে নৌকা দিয়ে সন্ধ্যার পরে যাচ্ছিল পাশের গ্রামে তার খালার বাড়িতে। সাথে আত্মীয় স্বজন ছিলেন। ওর দাদী মানে আমার মাও ছিলেন। কিন্তু

মাঝপথে নৌকায় ফুটো হয়ে পানি উঠতে থাকলে নৌকা দ্রুত পাড়ে ভিড়ানো হয়। সেদিন অন্ধকারে নৌকা ঠিক করার পর যখন আবার সবাই উঠে বসলেন তখন তাকে আর পাওয়া গেল না। তখন হারিকেন ছিল। হারিকেন দিয়ে চারপাশে খোঁজা হল। নদীর পাড়ে এসব জায়গায় ঝোপঝাড় অনেক। শেষে তাকে অজ্ঞান অবস্থায় একটি ভাঙ্গা পুরনো কালী মন্দিরে পাওয়া গিয়েছিল। তাকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। দুদিন পরে জ্ঞান ফিরে। জ্ঞান আসার পর সে অপ্রকৃতিস্থের মত আচরণ শুরু করে। সেই প্রথমবার তাকে নিয়ে মানসিক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হই। উনার কথামত হাসপাতালে ভর্তি করি। অবশ্য এক সপ্তাহের মধ্যে সে ভালো হয়ে যায়। তবে এরপর থেকে কিছুটা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল।"

"আচ্ছা, উনার কি পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে ভাল সম্পর্ক ছিল?"

"না। ছিলো না। সে সবসময় তার নিজের জগৎ নিয়ে ব্যস্ত থাকত। আত্মীয় স্বজন এবং সম্পর্ক বিষয়ে সে ছিল উদাসীন।"

"ওকে। পরের ঘটনাটি বলুন?"

"পরের ঘটনাটি ঘটে আজ থেকে আট নয় বছর আগে। তার একটি বই আছে, "লোমহর্ষক"। আপনি নাম শুনে থাকতে পারেন। বেশ নাম করেছিল বইটি। সে বইটির কাহিনী এক প্রাচীন ভাঙ্গা বাড়িতে বাস করে এক

অশুভ দেবীর কিছু মানবিক অনুভূতি নিয়ে। বইটিতে দেবী চরিত্রটি মোরালি ক্রিটিক্যাল। ফলে অনেক জায়গায় প্রশংসিত হয়েছিল। এই বইটি লেখার সময় সে একটি ভাঙ্গা বাড়িতে প্রায়ই যেত। সে বাড়ির কেয়ার টেকারের কাছ থেকে চাবি নিয়ে একা একাই ঢুকে পড়ত। বের হবার সময় চাবি ফেরত দিয়ে আসত। একদিন কেয়ারটেকার লক্ষ্য করল সে সকালে চাবি নিয়ে গেছে কিন্তু বিকেল হয়ে গেছে, চাবি ফেরত দেয়নি। কেয়ারটেকারের মনে দুশ্চিন্তার উদয় হয়। সে ভিতরে প্রবেশ করে এবং ভাঙ্গা বাড়িটার এক কোনে পুরনো এক নারী মূর্তির সামনে তাকে অজ্ঞান অবস্থায় আবিষ্কার করে। তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়। তখন আবার পাঁচ ছয়দিন সে অপ্রকৃতিস্থ ছিল।"

"বাড়িটা কোথায়?"

"চৌধুরী লজ। ব্রিটিশ আমলের বাড়ি। ওই মানিকপীরের টিলার গোরস্থানের লাগোয়া।"

উৎসাহে সাইদুর রহমানের চোখ চকচক করে উঠল। তার মনে এই চিন্তা আসল যে এখনো পলোনিয়াসের সাথে এই লেখকের খুনের সম্পর্ক থাকা অস্বাভাবিক কিছু না। আবার সেই গোরস্থান এলাকার সংশ্লিষ্টতা যেহেতু।

সাইদুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন, "সেই পুরনো মায়াদের বইটি সম্পর্কে বলুন। আমি জানি এ ব্যাপারে আপনি কারো কাছে মুখ খুলেননি। কিন্তু এখানে আপনার ছেলের খুনের ব্যাপার জড়িত। এর স্বার্থে আপনি আমাকে সত্যিটা বলুন।"

বুড়ো লোক একটু অবিশ্বাসী স্বরে বললেন, "আপনি সত্যি শুনতে চান? তাহলে বলুন, কেন আমি এতদিন কাউকে বলিনি? আমার ছেলের মৃত্যুর পর এই বই নিয়ে কিছু লেখালেখি হয়েছিল। অনেকে এসেছে। সাংবাদিকেরা এসেছে। কিন্তু আমি কাউকে বলিনি। কেন বলিনি?"

ভদ্রলোক উত্তরের আশায় সরাসরি সাইদুর রহমানের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সাইদুর রহমান কিছুটা বিব্রত বোধ করলেন। তিনি বললেন, আমি সঠিক বলতে পারব না। তবে আমার ধারনা এটি আপনাদের পরিবারের কোন গোপন বিষয় তাই।"

লেখক আফসার উদ্দিনের বাবা সামান্য হেসে বললেন, "আংশিক ঠিক বলেছেন। এটি আমাদের পরিবারের একটা গোপন বিষয়। কিন্তু আরেকটা কারণও আছে না বলার পিছনে। তা হল, লোকে বিশ্বাস করবে না। হাসাহাসি করবে। কে চায় নিজেদের পরিবারের প্রাচীন ইতিহাসকে হাসির উপকরণ বানাতে?"

সাইদুর রহমান আগ্রহ অনুভব করলেন। কিন্তু এই সময়ে এক তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠের চিৎকার ভেসে এল ভিতরের ঘর থেকে।

"বান্দির পুতেরা আইছে, আমারে নিয়া যাইব, আমি যামু না, যামু না।"

ইত্যাদি আরো অনেক কিছু। কিছু অশ্রাব্য গালিগালাজ।

সাইদুর রহমান খানিকটা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। লেখকের বাবা বললেন, "কিছু মনে করবেন না। আমার স্ত্রী। বদ্ধ উন্মাদ। দিনে চার ছয়বার সে দেখে কারা যেন তাকে নিতে এসেছে। তাদের গালিগালাজ করে। কিছু মনে করবেন না। প্রতিটি অসুখী পরিবার তাদেও নিজস্ব কিছু গোপন অন্ধকার বয়ে বেড়ায়।"

সাইদুর রহমান বললেন, "না। কিছু মনে করার কি। আপনি বলুন।"

ভদ্রলোক আবার চশমা খোলে পাঞ্জাবীর হাতায় পরিষ্কার করতে করতে বললেন, "আপনি অশোক সম্পর্কে জানেন তো? সম্রাট অশোক?"

"হ্যাঁ। কিছুটা জানি।"

"প্রাচীন ভারতে দুজন সম্রাটের আগে দি গ্রেট লাগানো হয়। এর একজন অশোক দি গ্রেট।"

"কলিঙ্গ যুদ্ধের পর তিনি অহিংসবাদী হয়ে যান।"

"হ্যাঁ। তিনি ছিলেন মৌর্য বংশের সম্রাট। মৌর্য সম্রাট অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধের বিভীষিকা দেখে অহিংসবাদী হয়ে যান। অবশ্য কিছু ভিন্নমতও আছে। কিন্তু সারকথা হল, তিনি যুদ্ধ বিগ্রহ হানাহানি, মানুষ হত্যা এসব থেকে দূরে সরে যান। এবং তিনি প্রতিষ্ঠা করেন এক গুপ্ত সংগঠন।"

"গুপ্ত সংগঠন?"

"হ্যাঁ। নয়জন মহান পন্ডিতের সমন্বয়ে এক পবিত্র গুপ্ত সংগঠন। যাকে ডাকা হয় নাইন আননোন ম্যান নামে। এই

সংগঠনের কাজ ছিল কিছু শ্রেষ্ঠ জ্ঞান সংরক্ষণ করে রাখা এবং সেসবের উন্নতি সাধন করে যাওয়া। সম্রাট অশোক বুঝতে পেরেছিলেন জ্ঞান বিজ্ঞানের সবকিছু সবার জন্য নয়। মূর্খ মানুষ এর অপব্যবহার করতে পারে। তবে জ্ঞান বিজ্ঞানের কিছু কিছু প্রকাশ হয়ে যায় বিভিন্ন সময়ে। মানুষের ব্যাপারে অশোকের ধারণা সঠিক ছিল। তার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই হিরোসিমা, নাগাসাকিতে কিংবা হিটলারের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের বিভীষিকায়।"

"তারপর?"

"তখন মানে সেই সংগঠন প্রতিষ্ঠার কালে অর্থাৎ সেই খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩ অব্দে এই নয়জন পন্ডিত নয়টি বিষয়ে অর্জন করেছিলেন সর্বোচ্চ জ্ঞান। এগুলো ছিল -

১। প্রোপাগান্ডা বা সাইকোলোজিক্যাল যুদ্ধের কৌশল, বর্তমান পৃথিবীতে এর গুরুত্ব কতটুকু তা সহজেই বোঝা যায়।

২। ফিজিওলজি, অর্থাৎ মানব শরীরের বিভিন্ন গোপন বিদ্যা। এখানে অন্তর্ভূক্ত টাচ অব ডেথের মত বিষয়াদি। ১৯৮৫ সালে ব্ল্যাক বেল্ট ম্যাগাজিনের এক আর্টিকেলে বিশ্বখ্যাত মার্শাল আর্টিস্ট ব্রুস লির মৃত্যুর কারণ হিসেবে টাচ অব ডেথকে ধরা হয়েছিল।

৩। মাইক্রোবায়োলজি, বলা হয়ে থাকে সম্রাটের অশোকের নির্দেশে নাইন আননোন ম্যানের একজন হিমালয়ের এক গোপন স্থান থেকে জলধারা এনে

মিশিয়েছিলেন গঙ্গার সাথে। এর ফলে গঙ্গার জল যেকোন রোগীকে সুস্থ করে তুলতো।

৪। আলকেমি, ধাতু থেকে সোনা বানানো সেই বহু আরাধ্য পদ্ধতি। অমরত্ব লাভের জ্ঞান।

৫। যোগাযোগবিদ্যা, মহাবিশ্বের বিভিন্ন বুদ্ধিমান প্রাণীর সাথে যোগাযোগও এর অন্তর্ভূক্ত।

৬। গ্র্যাভিটি ও এন্টি গ্র্যাভিটি

৭। কসমোলজি, স্থান কাল, টাইম ট্রাভেল, ইউএফও এসব নিয়ে জ্ঞান।

৮। আলোকবিদ্যা

৯। সমাজবিজ্ঞান

আপনার শুনতে কি রূপকথার মত লাগছে?"

সাইদুর রহমান বললেন, "না...... তবে আপনি বলে যান।"

ভদ্রলোক বলতে থাকলেন, "পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিরা এই নয়জন সম্পর্কে আগ্রহী হয়েছেন বিভিন্ন সময়ে। এরা বিভিন্ন সময় অনেকের সাথে যোগাযোগ করেছেন। অনেক সময় অনেক বিজ্ঞানীকে সাহায্য করেছেন। যেমন লুই পাস্তুরকে করেছিলেন জলাতঙ্কের টীকা আবিষ্কারের সময়। লুই পাস্তুর কোন গোপন সংগঠনের সদস্য ছিলেন, জানেন কি?"

সাইদুর রহমান মাথা নেড়ে বললেন, "না, জানিনা।"

ভদ্রলোক বললেন, "ফ্রি ম্যাসনারি। এছাড়া পোপ দ্বিতীয় সিলভেস্টারের যোগাযোগ হয়েছিল এদের কোন একজনের সাথে। আরও অনেকের সাথে অনেক সময় হয়েছে। তা আপনি খোঁজলে পাবেন। তবে সিলভেস্টারেরটা বলছি কারণ এর সাথে আমাদের ঘটনা কিছুটা যুক্ত।"

ভদ্রলোক একটু থেমে বললেন, "সিলভেস্টার এসেছিলেন ভারতে। তারপর তিনি দেশে ফিরে যান। সাথে নিয়ে যান একটি ব্রোঞ্জের তৈরী মাথা। এই মাথা তার বিভিন্ন প্রশ্নের হ্যাঁ বোধক বা না বোধক উত্তর করতে পারতো। এছাড়া আরো অনেক ক্ষমতা ছিল এই মাথার যা সঠিকভাবে জানা যায়নি। এই মাথাটি হাজার হাজার বছরের পুরনো। প্রাচীন মায়ানরা এই মাথাটিকে প্রার্থনার সময় ব্যবহার করত। এই মাথাটিকে ব্যবহার উপযোগী করার আগে নির্দিষ্ট কিছু প্রথা অনুযায়ী কিছু কাজ করতে হতো। সিলভেস্টার তা জানতেন। কিন্তু কাউকে বলে যাননি বা কোথাও লিখে যান। এমনিতেই তার জীবন রহস্যে পরিপূর্ণ ছিল।

ডিয়াগো ডি লান্ডা নামের ফ্রান্সিসকান মোনক মায়াদের প্রায় বই পুস্তক ধ্বংস করে ফেলেছিলেন। মাত্র একটা বই বেঁচে যায়। সেটি এক ইংরেজ দুর্গ থেকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন আমার এক পূর্বপুরুষ। তারপর থেকে সেটি আমাদের সাথেই ছিল। তারপর একদিন সেই নাইন

আননোন ম্যানের একজন আমার এক পূর্বপুরুষকে এই বইটি সংরক্ষণ করার নির্দেশ দিয়ে যান। এর কথা আমাদের পরিবারের লোক ছাড়া আর কেউ জানত না।"

ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন।

সাইদুর রহমান আস্তে করে জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর?"

ভদ্রলোক বললেন, "তারপর এই মাস ছয়েক আগে আফসার এসে নিয়ে গেল। সে নাইন আননোন ম্যানের কথা বিশ্বাস করত না। বলতো এগুলো গালগল্প। নিজে এই বই নিয়ে উপন্যাস লিখতে চেয়েছিল। লিখতে পারল না।"

"আপনি উনাকে বাঁধা দেননি?"

"দিয়েছিলাম। শুনেনি।"

"আপনার কী ধারণা বইটা নিয়ে? এটা সম্পর্কে কার আগ্রহ থাকতে পারে?"

"সম্ভবত তারই বেশি আগ্রহ থাকবে যে স্কালটা অর্থাৎ সেই ব্রোঞ্জের মাথাটা সম্পর্কে জানে। তবে আফসার ওসব বিশ্বাস করতো না কোনদিন।"

"কিন্তু এই আননোন ম্যানেরা কি এতদিন বেঁচে আছেন?"

লেখকের বাবা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "হ্যাঁ। মৃত্যুকে জয় করার জ্ঞান তাদের জানা ছিল।"

সাইদুর রহমান সরাসরি প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি মনে করেন আফসার উদ্দিন সাহেবের মৃত্যুর সাথে সেই রহস্যময় গুপ্ত সংগঠনের কোন সংশ্লিষ্টতা আছে?"

লেখকের বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "আমি জানি না। থাকলেও তাদের কেউ কিছু করতে পারবে না।"

লেখক আফসার উদ্দিন মানিকপীরের টিলা গোরস্থানের পাশের পুরনো বাড়ি চৌধুরী লজের ভিতরে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তার লোমহর্ষক নামক উপন্যাস লেখতে গিয়ে। সাইদুর রহমান বইটি সংগ্রহ করলেন। বইটি প্রকাশ করেছে ওয়ান বাই ওয়ান প্রকাশন। যার সেই মালিক পুরনো জিনিসপত্র সংগ্রাহক তরিক আলী সাহেব।

আফসার উদ্দিন চৌধুরী লজ দেখতে যাবার আগে তরিক আলীর অফিসে গেলেন তাকে সাথে নেবার জন্য।

তরিক আলী পান খেতে খেতে বললেন, "এটা কোন সমস্যাই না। উনি আমার বন্ধুলোক আছিলেন। তার মৃত্যু রহস্য উদঘাটনে আমি যদি কোন ভূমিকা রাখতে পারি তাইলে বড় খুশি হই।"

অফিসের কিছু কাজ কয়েকজনকে বুঝিয়ে দিতে দিতে তরিক আলী বললেন, "স্যার, মেলা সামনে। প্রচুর কাজের চাপ বিয়াল্লিশটা বই একসাথে বাঁধাই হইতেছে। তাও

আবার নামকরা লেখকদের বই। ভুল হইলে ইজ্জতের ফালুদা!"

সাইদুর রহমানের সাথে তরিক আলী বেরিয়ে পড়লেন প্রায় পনেরো মিনিটের মধ্যে। চৌধুরী লজে যেতে লাগল প্রায় বিশ মিনিট। বাড়িটা অনেক পুরনো। কেউ এদিকটাতে আসে না। লোকমুখে শোনা যায় এ বাড়িতে ভূতের আছর আছে। ঘরের ভেতরে বেশ কয়েকটা ভাঙা মূর্তি। দামী কিছু না, সাধারণ সিমেন্ট দিয়ে বানানো। ভেঙ্গে গেছে তাই দেখতে হয়ে পড়েছে কুৎসিত। এগুলোকে আলো আঁধারির মাঝে একা একা দেখে হঠাৎ ভয় পেয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু না।

সাইদুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন, "এই বইটা লেখার সময় যখন তিনি অসুস্থ হন তখনকার অবস্থাটা একটু বলুন।"

"আমি তখন আছিলাম লন্ডনে। একটা ফেস্টিভ্যালে গেছিলাম। যাওয়ার তিনদিন পর শুনি এই কাহিনী।"

"আচ্ছা, কোন ব্রোঞ্জের মূর্তি বা মূর্তির মাথা তার সাথে দেখেছিলেন?"

"মানে আপনি কি প্রাচীন মায়াদের ব্রোঞ্জের মাথার সাথে উনার এই ঘটনারে মিলাইতে চাইতেছেন?"

সাইদুর রহমান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি জানলেন কী করে?"

তরিক আলী বললেন, "তার আগে আপনে বলেন, আপনে আফসার সাবের বাপের লগে কথা কইছেন? উনাদের ফ্যামিলিটাই একটু ইয়ে। উনারা সবাই একটা ডিল্যুশনে ভোগেন। কীসব সম্রাট অশোকের আমলের গুপ্ত সংগঠন নিয়া।"

হাঁটতে হাঁটতে সাইদুর রহমান বললেন, "তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। আমারেও লেখকের আব্বা এই কাহিনী বার বার কইছেন। আমি বিশ্বাস করি নাই। আজগুবি কথা। লেখক আফসার সাবও এইসব বিশ্বাস করতেন না।"

সাইদুর রহমান বললেন, "আমিও যে বিশ্বাস করি এমন না। তবে ক্রাইমের ক্ষেত্রে অযৌক্তিক অনেক কিছুর মধ্যেও পুরো ঘটনার বীজ লুকিয়ে থাকতে পারে। হতে পারে নাইন আননোন নাম নিয়ে কেউ লেখকের বাবাকে ভয় দেখিয়েছে। এমনকী লেখকের খুনের সাথেও তাদের সম্পৃক্ততা থাকতে পারে। কিছুই অসম্ভব না।"

মাথা নেড়ে তরিক আলী বললেন, "তা পারে। তবে কথা হইতেছে আজ কালকার যুগে এইসব কি আর চলে?"

সাইদুর রহমান হেসে বললেন, "হাতের তিনটা আঙ্গুলে রত্ন পাথর ব্যবহার করে এসবকে বুজরুকী বলা কি ঠিক তরিক আলী সাহেব?"

তরিক আলী যেন লজ্জা পেলেন এমন ভাব করে হাত পাঞ্জাবীর পকেটে ঢুকিয়ে বললেন, "বিশ্বাস করেন স্যার, জ্যোতিষে আমার বিশ্বাস নাই। সব বউয়ের জন্য আঙ্গুলে

পড়ছি। আমার বউ এইসবে বিশ্বাস করে। সেই এগুলো সংগ্রহ করে দিছে। বউয়ের বিরুদ্ধে গিয়া খুইলা রাখার মত সাহস আমার নাই।"

তরিক আলী "হে হে" করে শব্দ করে হাসলেন।

সাইদুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন, "প্রাচীন জিনিসপত্রের ব্যাপারে আপনার অনেক আগ্রহ আছে। উনার বইটা যখন প্রথম দেখলেন তখন ওটাকে আপনার কালেকশনে নেয়ার ইচ্ছে হয়নি?"

তরিক আলী এই প্রশ্নে যেন থমকে দাড়ালেন। তার হাসিমুখ কালো হয়ে গেল সহসাই। তিনি চোখ ছোট ছোট করে বললেন, "আপনি কি আমাকে সন্দেহ করছেন?"

সাইদুর রহমান বললেন, "কেউই সন্দেহের বাইরে না।"

তরিক আলী খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললেন, "হয় নাই বলব না, তবে জানতাম বইটা পাওয়া যাবে না। কারণ বইটা উনার অনেক প্রিয় আছিল। কোন কিছুর বিনিময়েই বইটা তিনি কাউরে দিতেন না। আমি চাই যেকোনভাবেই হোক বইটা আপনারা খুঁইজা বাইর করেন।"

চৌধুরী লজ ততক্ষণে দেখা শেষ হয়েছে। তরিক আলী সাহেব আর বেশি কিছু বললেন না, সাইদুর রহমানও আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

সাইদুর রহমান সেদিন রাতে একগাদা উদ্ভট তথ্য মাথায় নিয়ে ফিরে এলেন। বাসায় এসেই নাইন আননোন ম্যান সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য ইন্টারনেট থেকে পড়ে

নিলেন। কয়েকটি বইয়ে চোখ বুলালেন। যা বুঝতে পারলেন, এটা এমন এক জিনিস, কখনও মনে হয় ভুয়া, আর কখনও মনে হয় সত্যিই এর অস্তিত্ব আছে।

পরদিন তার ঘুম ভাঙলো এক ভয়াবহ খবর পেয়ে। পলোনিয়াস হাসপাতালে তার রুমে আত্মহত্যা করেছে।

এই আত্মহত্যার খবরে সাইদুর রহমানের হতবুদ্ধি হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা হল। কিন্তু তিনি যথাসম্ভব মাথা ঠান্ডা রেখে ফোনে এক অফিসারকে বললেন, "এটা কি আত্মহত্যা না খুন মনে হচ্ছে?"

ওপাশ থেকে অফিসার জানাল, "দেখে কিছু বুঝা যাচ্ছে না স্যার। আপনি এলে বুঝতে পারবেন। লোকটা জানালার গ্রীলের সাথে গলায় ফাঁস দিয়েছে।"

"কোন অস্বাভাবিক কিছু?"

"জ্বী স্যার। রুমে পাথরের তৈরী গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের মাথা পাওয়া গেছে।"

সাইদুর রহমান নির্দেশ দিলেন, "সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণে রাখ। আমি আসছি।"

তিনি খুব দ্রুত তৈরী হলেন। বাড়ি থেকে বের হবে ঠিক এমন সময়ে দেখলেন তার গেটের সামনে গোয়েন্দা বাহিনীর একজন কর্মকর্তা দাঁড়িয়ে। তার সাথে একটি বৃদ্ধ লোক।

সাইদুর রহমানকে দেখে তারা এগিয়ে এল। গোয়েন্দা বাহিনীর অফিসার বলল, "স্যার, এই লোককে আমরা

খুঁজে পেয়েছি। এর বাড়ি মুন্সীগঞ্জের এক গ্রামে। সে পলোনিয়াসকে চিনত।"

সাইদুর রহমান পলোনিয়াসের পরিচয় বের করতে গোয়েন্দাদের লাগিয়ে রেখেছিলেন। খোঁজ যে পাওয়া যাবে তার ধারণা ছিল না। কিন্তু যদি পাওয়া যায়, এই চিন্তা থেকেই লাগিয়েছিলেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে পরিচয় পাওয়া গেছে। এমন দিনে পাওয়া গেল যেদিন লোকটা মারা গেছে।

সাইদুর রহমান ভেবে দেখলেন এই লোকটার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলেই হাসপাতালে যাওয়া ভালো হবে। হাসপাতালে অনেক পুলিশের সদস্য আছে। তার ব্যাপারটা ভালোভাবেই হ্যান্ডেল করতে পারবে।

সাইদুর রহমান লোকটাকে নিয়ে এলেন তার বসার ঘরে। লোকটা শান্তভাবে বসল।

সাইদুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি ঐ লোকটাকে চিনতেন?"

লোকটা ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, "জ্বী স্যার। আমি ছবি দেখেছি। এই লোক আমাদের গেরামে ছিল।"

"সে কী করত

"পড়াইত স্যার।"

"কতদিন আগে?"

"এই ধরেন বিশ বছর বা একুশ বছর হবে।"

"পড়াত, তারপর?"

"সে খুব ভালো লোক আছিল। পড়াইত বাইচ্চাদের। আমাদের ইস্কুলে। আমাদের গেরামের লোকদের আপদে বিপদে ছুইটা আসত।"

"তারপর?"

"হেরপর একদিন চেয়ারমেন সাব তারে বাইর কইরা দিলেন। তারে অনেক মারা হইছিল। হাত বাইন্ধা মারা হইছিল। তখন গেরামের কেউ তারে বাঁচাইতে যায় নাই।"

"কেন মারল?"

"চেয়ারমেন সাবের মেয়ের সাথে তারে নাকি কোথায় দেখা গেছিল। আরো কিছু ঘটনা আছে। আর কিছু কথা ছড়াইছিল মন্দলোকে। তাই চেয়ারম্যান আসগর তালুকদার তারে মাইর দিছিলেন। বাইর কইরা দিছিলেন। চেয়ারমেন সাবও এখন আর নাই। গত রমজানের তিন রমজান আগে মারা গেছেন।"

"তারপর সে কোথায় গেল?"

"তা জানিনা স্যার।"

"সে কি আপনাদের গ্রামেরই ছেলে ছিল?"

"না স্যার। সে কোনহানকার ছিল জানি না। আমাদের গেরামে আইছিল। পড়াইত বাইচ্চাদের।"

সাইদুর রহমান পাশে বসা গোয়েন্দা অফিসারকে বললেন, "তথ্য ভেরিফাই করেছেন?"

অফিসার মাথা নেড়ে বললেন, "জ্বী স্যার। গ্রামের অনেকে তাকে চিনতে পেরেছে।"

সাইদুর রহমান এদেরকে বিদায় করে হাসপাতালে গেলেন। হাসপাতালের সামনে পুলিশের গাড়ি, সাংবাদিকদের ভীড়। সাইদুর রহমান ভিতরে প্রবেশ করলেন। তাকে পলোনিয়াস রুমে নিয়ে যাওয়া হল। পলোনিয়াসকে দেখেই সাইদুর রহমানের মনে হল এটি আত্মহত্যা না। ঠান্ডা মাথার খুন। জানালার পাশে একটা ছোট টেবিলে পাথরে তৈরী গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের মাথা দেখা যাচ্ছে। সাইদুর রহমান কাছে গিয়ে মাথাটি হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন।

ঠিক একইভাবে লেখক আফসার উদ্দিনকে পাওয়া গিয়েছিল জানালার সাথে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মৃত অবস্থায়। সেই একই হাসপাতাল। এবং ভয়ংকর কাকতালীয় ব্যাপার সেই একই রুম। কিন্তু তখন এরকম কোন পাথরের মূর্তি পাওয়া যায়নি।

একজন অফিসার হাসপাতালের টুডি প্ল্যান সাইদুর রহমানকে দেখাতে দেখাতে বলল, "স্যার, এই রুমটাই হাসপাতালের সবচেয়ে নির্জন রুম। এর ডানপাশ এবং বামপাশের দুটি রুমই খালি।"

সাইদুর রহমান চিন্তিতভাবে প্ল্যানটি দেখলেন। তার মাথায় বিভিন্ন ধরনের চিন্তা খেলা করছে। এই দুটি খুনের সূত্র কি এক? সূত্র কি সেই বই? দার্শনিকেরা? নাইন আননোন ম্যান? কিংবা এই হাসপাতালের সাথে কি যুক্ত আছে এমন কিছুর?

একজন অফিসার একটি কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলল, "স্যার, এটা পাওয়া গেছে। মৃতদেহ সরাতেই দেখা গেছে পাশে পড়ে আছে।"

সাইদুর রহমান কাগজটি হাতে নিয়ে দেখলেন নীল কালিতে লেখা আছে,

ইচ্ছে করে মনের মধ্যে তোমার মৃতদেহ পোড়াই
ইচ্ছে করে যখন নীলে ঐ পুরনো আকাশ জোড়াই
শুনেছি হতাশ উট আত্মহত্যা করার তাড়সে
মাইল মাইল যায় রোদের আগুনে উড়ে-পুড়ে
তুমি কেমন বিষে আমাকে আজ হত্যা করো?

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

সাইদুর রহমান কিছুক্ষণ ভ্রু কুঁচকে কবিতাটি দেখলেন। তারপর বললেন, "এটিকে হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্টদের কাছে নিয়ে যাও। পলোনিয়াসের হাতের লেখার সাথে এর মিল আছে মনে হচ্ছে।"

অফিসার বলল, "জ্বী স্যার। পলোনিয়াসের লেখার সাথে আমরা মিলিয়ে দেখেছি। এটা তারই হাতের লেখা আমাদেরও মনে হচ্ছে।"

সাইদুর রহমান বললেন, "তবুও হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্ট এবং গ্রাফোলজিস্টরা একে দেখুক, আমরা তো এ থেকে তেমন কিছু পাবো না। লেখকের মৃত্যুর পরেও তো এরকম চিরকুট পাওয়া গিয়েছিল। অপরাধী লিখে রাখলে একে সিগনেচার এসপেক্ট ধরা যেত, কিন্তু এখানে তো ভিকটিম নিজেই লিখে রেখেছে!"

অষ্টম অধ্যায়

অফিসে এসে সাইদুর রহমান ঠান্ডা মাথায় কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিলেন। স্কুলজীবনে তার ডিসাইডোফোবিয়া ছিল। কিন্তু পরে তা কাটিয়ে উঠেছেন। তবুও বড় কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে তিনি মাথা ঠান্ডা রাখতে পছন্দ করেন।

তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন,

এক, আইন শৃঙ্খলা রক্ষার সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তিদের দার্শনিক বা এই সন্ত্রাসীদের নিয়ে বিস্তারিত জানাবেন আবার। এবং জরুরী ভিত্তিতে এদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্য আবার অনুরোধ করবেন।

দুই, চৌধুরী মেমোরিয়াল হাসপাতালের লোকগুলোকে পর্যবেক্ষণের আওতায় আনবেন।

তিন, লেখক আফসার উদ্দিনের বাবার বলা কথাগুলো নিয়ে কিছুটা রিসার্চের জন্য কয়েকজনকে নিযুক্ত করবেন।

এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ তিনি মনে করেন দার্শনিকদের বিষয়টি। গত দশ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে তিনি এদের নিয়ে কর্তাব্যক্তিদের কাছে রিপোর্ট করে আসছেন। একশন নেয়ার অনুরোধ করে আসছেন। কিন্তু তারা পাত্তা দিচ্ছেন না। এমনকী একটা মিটিং এ পরোক্ষভাবে তার মানসিক সুস্থতার ব্যাপারে সূক্ষ্ম এক

খোঁচা দিয়েছিলেন দেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি সবুর খান। তিনি অবশ্য হালকা চালেই খোঁচাটা দিয়েছিলেন। তার সে অধিকারও আছে। কারণ সাইদুর রহমান তরুণ বয়সে এই সবুর খানের ডিপার্টমেন্টেই দীর্ঘদিন কাজ করেছিলেন। সবুর খান তখন ছিলেন ডিভিশনাল হেড। দীর্ঘদিনের পুরনো সম্পর্ক। সবুর খান তাকে অনেক স্নেহ করতেন। কিন্তু তবুও সেদিনের খোঁচাটি বেশ সিরিয়াসলি নেন সাইদুর রহমান। এরপর থেকে তিনি আর এই সংগঠনের ব্যাপারে নতুন কিছু রিপোর্ট করেননি।

সাইদুর রহমান ইমেইল খোলে একটি ইমেইল লিখলেন দার্শনিক খোলসধারী সংগঠনটির কার্যকলাপ নিয়ে। আহবান জানালেন শীঘ্রই পদক্ষেপ নেয়ার। তারপর ডিপার্টমেন্টের হাই কমান্ডের ঠিকানায় সেন্ড বাটন ক্লিক করেই একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। হয়তো কোন পদক্ষেপই নেয়া হবে না।

কিন্তু এবার তিনি তাতে থেমে যাবেন না। নিজেই একশন নিবেন কোন ধরনের অনুমতি ছাড়া। এর জন্য তার বিশেষ বাহিনী মোটামোটি প্রস্তুত। শহরের স্থানে স্থানে দার্শনিকদের মোবাইল ফোন কথাবার্তা ট্র্যাক করার জন্য যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছে গোপনে। গোপনে যন্ত্রপাতি এনে সবকাজ করতে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। কিন্তু ডিপার্টমেন্টের উপরের স্তর থেকে নির্দেশ পাওয়া

গেলে সহজেই আভ্যন্তরীন অপারেটর বা ইন্টারকানেশন এক্সেঞ্জগুলোর মাধ্যমে মোবাইল ফোনের কথোপকথন ব্যবহার করে লোকেশন বের করা যেত। কিন্তু এই কাজটি এখন করতে বিদেশ থেকে লুকিয়ে আনতে হয়েছে বিশেষ সব যন্ত্র। মেধাবী টেকী লোক লাগিয়ে রাখা হয়েছে। শীঘ্রই এদের অবস্থান সম্পর্কে কিছু জানা যাবে।

এই অভিযানের জন্য দীর্ঘদিন ধরে মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছেন সাইদুর রহমান। অবশ্য বিশেষ বাহিনীর কারো সাথে এ নিয়ে আলাপ করেননি। করার প্রয়োজনও নেই। তারা অনেক সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অভিযানে অংশ নিয়েছে। এরাও একধরনের সন্ত্রাসী। সুতরাং, অভিযানের আগে ব্রিফ দিলেই চলবে।

সাইদুর রহমান নিশ্চুপ হয়ে ভাবছিলেন। এমন সময় বিশেষ বাহিনীর তরুণ এক অফিসার, যার কাজ বাহিনীর কোন সমস্যা হলে তা নিয়ে সাইদুর রহমানের সাথে কথা বলা, জিজ্ঞেস করল, "আসতে পারি স্যার।"

"আসো।"

"স্যার, একটা সমস্যা, তাই আপনার সাথে কথা বলতে এলাম।"

"কি সমস্যা?"

"স্যার, আপনি তো হাসিবকে চিনেন? পলোনিয়াসকে যে ফলো করেছিল?"

"হ্যা, সেই ব্রাইট ছেলেটা, কি হয়েছে তার?"

"মানে ...স্যার, তার একটা সমস্যা।"

"ওকে, সমস্যাটা বলো?"

"ও গত ক'দিন ধরে রিপোর্ট করেনি।"

"রিপোর্ট করেনি, করবে। এতে কি সমস্যা?"

"স্যার, ওকে আমরা দিনে পাঁচ ছয় ঘন্টার জন্য ট্র্যাক করতে পারছি না। কম্পিউটার ডিপার্টমেন্ট থেকে জানানো হয়েছে। এছাড়া তার আচরণ বেশ সন্দেহজনক।"

"কীরকম?"

" সে রিপোর্ট করে না। কারো সাথে তেমন কথাও বলে না। আর যে পাঁচ ছয় ঘন্টা তাকে ট্র্যাক করা যায়নি, ওইসময় সে কোথায় ছিল তা কেউ বলতে পারেনি।"

"কয়দিন ধরে এরকম হচ্ছে?"

"আজ নিয়ে আটদিন। স্যার, আমি আজ জানতে পেরেছি। কম্পিউটার ডিপার্টমেন্ট ট্র্যাকিং এর বিষয়টা গতকাল খেয়াল করেছে হঠাৎ।"

"হাসিব ছেলেটাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছ?"

"জ্বী না স্যার। তাকে কিছু জিজ্ঞেস করা হয়নি।"

"জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। ফলো করো। আর আমাকে আপডেট জানাও।"

সাইদুর রহমান আরো চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এই ছেলের ঘটনা কি জানা দরকার। পলোনিয়াস যখন সাংবাদিকদের সামনে বাঁধা ছিল তখন সে সাংবাদিকদের

প্রশ্নে কোন বাঁধা দেয়নি। সেই সময়েই সাইদুর রহমানের কাছে কেমন জানি ঠেকেছিল ব্যাপারটা।

তবে আরো অদ্ভুত কিছু ঘটনা অপেক্ষা করে ছিল তার জন্য। তিনি সেদিন বিকেলে চৌধুরী মেমোরিয়াল হাসপাতালে যান। গিয়ে হাসপাতালের মালিকের খোঁজ করেন। মালিক কোথাও ভ্রমণে গিয়েছিলেন। ফোনে জানালেন কাল আসবেন। ডাক্তারদের জিজ্ঞেস করতে গিয়ে দেখা গেল বেশিরভাগই আজ আসেননি। সাইদুর রহমান বেশ বিরক্ত হলেন।

রেজিস্টারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন "৭০২ নাম্বার রুমে এই নিয়ে আত্মহত্যা কয়টা হল?"

রেজিস্ট্রার লোকটা মধ্যবয়স্ক। রোগা চেহারা এবং চোখে কালো ফ্রেমের চশমা।

লোকটি বলল, " এ নিয়ে দুইটা। লেখক আফসার উদ্দিন আর এই লোক।"

সাইদুর রহমান বললেন, "রেজিস্ট্রার খাতাটা দেখতে পারি?"

লোকটা খাতা এগিয়ে দিল। সাইদুর রহমান খুলে আফসার উদ্দিনের এন্ট্রি বের করলেন। যেদিন তিনি মারা যান সেদিন রাতে তার ডিউটি ডাক্তার ছিলেন ডাক্তার হারুণ। এই ডাক্তার হারুণের সাথে আফসার উদ্দিনের আগেও কথা হয়েছে মনে হল। আর সহযোগী নার্স ছিলেন মৃণালিনী দেবী।

সাইদুর রহমান পলোনিয়াসের এন্ট্রি বের করলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার! যেদিন পলোনিয়াস মারা যায় সেদিনও ডিউটিতে এই দুজন ছিলেন!

সুতরাং, এদের জিজ্ঞেস করলে কিছু তথ্য পাওয়া যাবে।

সাইদুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন, "ডাক্তার হারুণ এবং মৃণালিনী দেবী, এরা আছেন আজ?"

রেজিস্টার বলল, "ডাক্তার হারুণ আছেন।"

সাইদুর রহমান গেলেন ডাক্তার হারুণের রুমে। হারুণের বয়স ত্রিশ হবে। দেখতে সুদর্শন। তিনি বেশ বিনয়ী ভঙ্গিতে উত্তর দিতে লাগলেন।

"পলোনিয়াস যেদিন মারা যায় সেদিন আপনি ওর রুমের ডিউটিতে ছিলেন। আফসার উদ্দিনের ক্ষেত্রেও তা ছিল। এই দুই আত্মহত্যা সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন?"

"হ্যাঁ। আপনার কথা ঠিক। আমাদের হাসপাতালে এরকম ভাগ ভাগ করা থাকে। কোন ডাক্তার কোন রাতে কতটি রুমের দায়িত্বে থাকবেন। এবং এই ভাগ ভাগ করার ক্ষেত্রে ডাক্তারদের কোনই হাত থাকে না। তা সম্পূর্ণভাবে ম্যানেজম্যান্টের উপর। দূর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, দুই আত্মহত্যার রাতে ডিউটিতে আমি ছিলাম।"

"আরেকজন ছিলেন। নার্স মৃণালিনী।"

"হ্যাঁ। তিনিও ছিলেন। ঐ যে বললাম ম্যানেজমেন্টের বিষয়। এখানে আমাদের করার কিছুই ছিল না। আপনি

ম্যানেজমেন্টে খোঁজখবর নিলেই জানতে পারবেন। সব ডাটা এন্ট্রি করা থাকে।"

"আচ্ছা, এই দুই রোগী, আমি দুজন নিয়ে বলছি যদিও আফসার উদ্দিনের মৃত্যুর পর একবার আপনার সাথে কথা বলেছিলাম অল্প সময়ের জন্য, এরা কি আত্মহত্যা প্রবণ ছিলেন?"

"না। আমি যতদূর এই দুইজন রোগীকে দেখেছি, এরা আত্মহত্যাপ্রবণ ছিলেন না। তবে এদের মানসিক অবস্থা স্ট্যাবল ছিলো না। তাই কিছু বলা যায় না।"

"আপনার কি মনে হয়?"

"আমার কিছুই মনে হয় না। আসলে আমি দুটি ঘটনাতেই খুব ডিপ্রেসড। আর আমার নিজেরও কিছুটা ভয় করছে। পত্রিকাতে বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ছি।"

"ভয় পাবেন না। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।"

সাইদুর রহমান একটা কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "এখানে মৃণালিনী দেবীর বাসার এড্রেসটা লিখে দিতে পারবেন?"

ডাক্তার হারুণ বললেন, "অবশ্যই।"

তিনি লিখে দিলেন। লেখার সময় তার হাত কাঁপছিল।

সাইদুর রহমান ডাক্তারের সাথে কথা বলা শেষ করলেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সাইদুর রহমান ডাক্তারের রুম থেকে বের হয়ে কাগজটার দিকে তাকালেন। লেখাটার সাথে পলোনিয়াসের মৃতদেহের সাথে পাওয়া কাগজের লেখাটার কোন মিলই পাওয়া যাচ্ছে না।

নবম অধ্যায়

এক বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিবের শুরু থেকে ছিল। তার বাবা আব্দুল মজিদের চেহারা ভালোমত তার মনে পড়ে না এখন আর। তাদের সেই বড় পরিবারটিকে মনে পড়ে। তারা ছিল নয় জন ভাইবোন। ছয় বোন তিন ভাই। তাদের বাবা আব্দুল মজিদ মা সুরতুন্নেছা বেগম। বড় ভাই আব্দুল হাশিমের বউ এবং দুই ছেলে মেয়ে ছিল। আর কাজের লোক একজন। সব মিলিয়ে পরিবারের লোকসংখ্যা পনেরো জন। কিন্তু হাসিব এই পরিবারের সাথে থাকতে পারেনি। খুব ছোটবেলায় তার নিঃসন্তান খালা তাকে নিয়ে এসেছিলেন। সেই থেকে নিজের পরিবারের সাথে খুব বেশি তার সংযোগ ছিল না। নিজের বাবা মা হিসেবে খালা খালুকেই চিনতো সে। সত্যিকার বাবা মায়ের ব্যাপারে সে জানতে পেরেছে অনেকদিন পরে। আর সেদিনই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাদের পিছনের রহস্য উদঘাটন সে করবেই।

এজন্য পুলিশে যোগ দিয়েছে, কৃতিত্বের সাথে কাজ করেছে। একসময় পুলিশ প্রধানের বিশেষ বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। অনেক অভিযানে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে।

কিন্তু কখনও এক মূহুর্তের জন্য সে ভুলে যায়নি তার সেই লক্ষ্যকে।

সেই বড় পরিবারটিতে বছরে দুয়েকবার যাওয়া হত কয়েকদিনের জন্য। স্কুলের ছুটিতে। রেললাইনের পাশে বড় টিনশেড বাড়ি। বাড়ির চারদিক মাটির বেড়া দিয়ে ঘেরা। গ্রামে অন্য কোন বাড়ি এরকম ছিল না। এই চারদিকের অদ্ভুত দেয়াল বাড়িটিতে বিশেষত্ব যোগ করেছিল যেন।

তার বাবা আব্দুল মজিদ ছিলেন খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক। বেশি কথা বলতেন না। তার গলার স্বর ছিল গাঢ়। স্বাভাবিকভাবে কথা বললেই পুরো ঘর গমগম করত।

তার মনে পড়ে খুব একটা ঝামেলা হয়েছিল কি নিয়ে। তারপর থেকে খালা তাকে গ্রামে যেতে দিতেন না। নিজেরাও খুব একটা যেতেন না। দেখলে মনে হত একটা আতংকের মধ্যে আছেন।

একদিন হাসিব দেখেছিল বুড়ো আব্দুল মজিদ একটা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বিছানায় অনবরত বাড়ি দিচ্ছেন আর চিৎকার করে গালাগালি করছিলেন কাকে যেন। তার সারা শরীর দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছিল। কিন্তু কোন এক তীব্র জিঘাংসায় তিনি বিছানা এবং বালিশকে আঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করছিলেন। এতই তীব্র ছিল আঘাত যে বালিশ কেটে তুলা বের হয়ে যায়। সে তুলা ঘরময় উড়ছিল প্রতিটি আঘাতের গতির সাথে তাল মেলাতে গিয়ে।

বাড়ির অন্যসব সদস্যরাও এসে দাঁড়িয়েছিলেন দরজায়। তারাও এক ভয়ার্ত মুখে দাঁড়িয়ে সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখছিলেন।

সেদিনের ঘটনার আর কিছু মনে পড়ে না।

কিন্তু আব্দুল মজিদ একবার হাসিবের কাঁধ ধরে বলেছিলেন, "আমি দেখতে পাচ্ছি, তুইই আমার অসমাপ্ত কাজ শেষ করবি।"

সেই গাঢ় স্বরের কথাটি এখনো হাসিবের কানে বাজে।

আব্দুল মজিদ যেদিন মারা যান সেদিনও শহর থেকে হাসিব খালার সাথে গ্রামে গিয়েছিল। গিয়ে দেখে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। উঠানে সমবেত হয়েছেন গ্রামের মুরুব্বী গোছের কিছু মানুষ। তাদের তীর্যক কথাবার্তা সিংহভাগই হাসিব বুঝতে পারেনি। তবে এটা বুঝতে পেরেছিল তার বড় ভাই আব্দুল হাশিমের সাথে মুরুব্বীদের ঝামেলা হচ্ছে আব্দুল মজিদকে কবর দেয়া নিয়ে।

আব্দুল মজিদ এমন কিছু বলে গিয়েছিলেন যা গ্রামের লোকেরা মানতে পারছেন না।

আব্দুল মজিদের কবর দেয়া নিয়ে ঝামেলা বিকেল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। শেষে পুলিশের মধ্যস্থতায় গ্রামের মুরুব্বীদের কথামত কবর দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তাই সেখানে পরিবারের কেউ যায়নি। গ্রামের লোকেরা গ্রামের নিজস্ব গোরস্থানে আব্দুল মজিদকে কবর দেয়।

সেদিন বড় ভাই এবং অন্যেরা তীব্র আক্রোশে চিৎকার করে কেঁদেছিলেন। এবং সেইদিনই প্রথম হাসিব দেখতে পায় বাড়ির পশ্চিম দিকের ছোট ঘরটা খোলা হয়েছে। সেখানে হাসিবের কিংবা তার খালার প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু বাড়ির অন্য সবাই প্রবেশ করেছিল। হাসিব খালার সাথে দরজার বাইরে তাকিয়ে দেখেছিল ময়ুরের ডানাওয়ালা মত এক বিকট মূর্তির সামনে মাথা নত করে কাঁদছে এবং অভিযোগ দিয়ে যাচ্ছে পুরো পরিবার। মূর্তিটি মানুষের মত, রঙ নীল। তার মুখ ভয়ংকর, দাতগুলো বের করা। মাথায় ঝমকালো মুকুট, দু হাতে মাথার উপর ভূমি সমান্তরালে ধরে আছে একটি নীল রঙের মশাল। মশালের দু'পাশে আগুন জ্বলছে। সে যেন যোগাসনে বসে আছে, আরো দুটি নীল হাত রাখা দুই হাঁটুতে।

এরপর থেকে আর কোনদিন হাসিবের গ্রামে যাওয়া হয়নি। কিন্তু সেই অদ্ভুত ঘটনা, সেই বিকট দর্শন ডানাওয়ালা মূর্তি তার মনে গাঢ় ছাঁপ ফেলেছিল। সে কোনদিন মূর্তিটাকে ভুলতে পারেনি।

যেদিন সেই বাড়িটি পুরো আগুনে ভষ্মিভূত হয়ে গেল, পরিবারের সকল সদস্য সহ তারপরদিন পত্রিকায় রিপোর্ট বেরিয়েছিল "ভয়ংকর এক ধর্মমতঃ বলি একই পরিবারের বারো জন।"

গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলে, পুলিশের সাথে কথা বলে এবং তেরো জন পরিবারের সদস্যের নিজস্ব ডায়রী

থেকে বিভিন্ন তথ্যাদির সাহায্যে পত্রিকা রিপোর্ট করেছিল। খুব গভীরে কেউ যায়নি। দুয়েক সংখ্যায় ফলো আপ করেছিল কোন কোন পত্রিকা। তারপর আগুন থেকে অদ্ভুত উপায়ে বেঁচে যাওয়া পরিবারের সদস্যদের লেখা ডায়রিগুলো পুলিশের হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়। প্যাগান আর্থ রিলিজিয়ন উইকা তে এরকম ধর্মের অনুসারীরা নিজেদের ডায়রী রাখে। যার নাম বুক অফ শ্যাডোজ। এতে লেখা থাকে তাদের আত্মরক্ষার কৌশল, হার্বাল হিলিং, তারা যা শিখেছে, পরিবারের ইতিহাস ইত্যাদি।

পত্রিকাগুলো উইকানদের সাথে এই ঘটনাকে মিলিয়ে মিশিয়ে কিছু রিপোর্ট করেছিল। কিন্তু তাতে মূল ঘটনা উঠে আসেনি। আগুনে ময়ুরের পেখমযুক্ত মূর্তিটি হয়তো ছাই হয়ে গিয়েছিল। তাই তার কথা কেউ লেখেনি। পত্রিকাগুলো খুব ফোকাস করেছিল যে ভয়ংকর ধর্মমতের কারণে তারা স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছে। প্রতিবেশীদের ভাষ্যে পত্রিকাগুলো লিখেছিল, তাদের পরিবারের নাবালক দুই শিশু সন্তানকে বেঁধে রাখা হয়েছিল খাটের সাথে যেন তারা পালিয়ে যেতে না পারে।

হাসিবের সমস্ত ব্যাপারটা পড়ে মনে হয়েছিল কোথাও একটা "কিন্তু" আছে। এরা নিজেদের মা বাবা এবং তার নিজের পরিবার জানার পর সেই ধারণা আরো গাঢ় হয়েছে তার।

হাসিব তাই বহু ধীরে ধীরে তৈরী হয়েছে। এজন্য তাকে বিশেষ বাহিনীর প্রতিটি সদস্যের উপর সবসময়

নজর রাখতে হয়েছে, কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টকে বোকা বানাতে হয়েছে। সব সদস্যকে সবসময় বাধ্যতামূলক একটি ঘড়ি পড়তে হয়। এই ঘড়ির ভিতরে থাকা বিশেষ মাইক্রোচিপের সাহায্যে তাদের গতিবিধি সব সময় কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টের কাছে পৌছে যায়। এই মাইক্রোচিপকে সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় করার কাজটি ছিল সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং। নিষ্ক্রিয় করার প্রক্রিয়া জানতে হাসিবকে অনলাইনে ব্যয় করতে হয়েছে ঘন্টার পর ঘন্টা।

আজ সে সম্পূর্ণরূপে তৈরী। হয়তো পুরোপুরি তৈরী হতে আরো কয়েকদিন লাগত। কিন্তু ইতিমধ্যে তার সন্দেহ হচ্ছে হয়তো কম্পিউটার ডিপার্টমেন্ট তার ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় কাজটা করে ফেলতে হবে। এরই মধ্যে দারুণ সাহায্য পাওয়া গেছে একটি গুপ্ত সন্ত্রাসী সংগঠনের কাছ থেকে। মূলত এজন্যই হাসিব আজ পুরোপুরি প্রস্তুত। সাইদুর রহমান যে সংগঠনকে ধ্বংস করতে উঠেপড়ে লেগেছেন তারাই হাসিবকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে সাহায্য করছে। কম্পিউটার হ্যাক করে ঠিক কত নম্বর খোপে ফাইলটা আছে তা এরাই জানিয়েছে তাকে।

হাসিব থানায় যেখানে গোপন নথিপত্র ভল্টে সুরক্ষিত রাখা হয় সেখানে প্রবেশ করল। দুজন পুলিশ অফিসার বসে গল্প করছিল। হাসিব তাদের কার্ড দেখিয়ে নিজের পরিচয় দিল বিশেষ বাহিনীর সদস্য হিসেবে।

একজন অফিসার বলল, "স্যার, আপনার জন্য কি সাহায্য করতে পারি?"

হাসিব শান্তভাবে বলল, "আমার ভল্ট থেকে একটা ফাইল দরকার।"

অফিসাররা বেশ অবাক হল। একজন বলল, "কিন্তু স্যার, হেড অফিসের নির্দেশ ছাড়া তো আমরা ভল্ট থেকে কোন ফাইল দিতে পারবো না।"

হাসিব বলল, "আপনাদের দিতে হবে না। বিশেষ প্রয়োজনে ফাইলটির দরকার। তাই হেড অফিস থেকে আমাকে চাবি দিয়ে পাঠানো হয়েছে।"

অফিসার দুটি ইতস্তত করছিল। হাসিব চাবি দেখিয়ে ভিতরের কক্ষে অর্থাৎ যে রুমে সংরক্ষিত ফাইলপত্র রাখা আছে সেখানে প্রবেশ করল। আটশ দু নাম্বার খোঁপ খোঁজে পেতে তার সময় লাগল এক মিনিটের মত। সময় খুব কম। ত্রিশ সেকেন্ড হেরফেরে জীবন চলে যেতে পারে।

খোঁপ দেখা মাত্র সে স্টীল কাটার দিয়ে এক মিনিটের মধ্যে খোঁপ কেটে ফাইল বের করে আনলো। তাড়াহুড়ায় কাটা স্টিলটি মেঝেতে পড়ে বেশ জোরে ধাতব শব্দ হল।

শব্দে একজন অফিসার উঠে এলো দেখতে। সে দরজা দিয়ে একটু এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে, স্যার?"

হাসিবের দিকে সে তাকিয়ে স্টিল কাটারটা হয়তো দেখে ফেলেছিল। তাই দ্রুত রিভলভারে হাত দিতে গেল।

কিন্তু ততক্ষণে হাসিবের রিভলভারের অব্যর্থ নিশানায় গুলি লোকটির কপাল ফুঁড়ে ভেতরে ঢুকে গেছে। রিভলভারে সাইলেন্সার লাগানো ছিল, তাই ঝপ করে একটা শব্দ হল শুধু।

কপাল দিয়ে রক্ত বের হতে হতে সে প্রায় ধপাস করেই পড়ে যাচ্ছিল। হাসিব দৌড়ে গিয়ে ধরলো তাকে। তা না হলে কলাগাছ মাটিতে পড়ার মত শব্দ হত। অফিসের বাইরে পুলিশেরা পাহাড়ায়। তাছাড়া পাশের রুমেই আরেক অফিসার।

হাসিব ফাইল নিয়ে সাধারণভাবেই সংরক্ষিত ফাইল পত্রের রুম থেকে পাশের রুমে গেল। সেখানে অফিসারটি বসে ছিল। হাসিবকে দেখে সে বলল, "ফাইল পেয়েছেন, স্যার?"

হাসিব বলল, "হ্যাঁ।"

হাজারহোক পুলিশের লোক, হয়তো হাসিবের ভাবভঙ্গি দেখে কিছুটা সন্দেহ অফিসারটির হয়েছিল। সে দরজার দিকে তাকাল অন্য অফিসারটি আসছে কি না দেখতে। হাসিব তখন টেবিলের পাশে। সে দেখল ঘাড় ঘুরিয়ে লোকটি পিছনে দরজার দিকে দেখছে।

হাসিব খুব দ্রুত রিভলভার মাথার পিছনের দিকটায় ঠেকিয়ে দুটি গুলি করল। লোকটি চেয়ারেই নেতিয়ে পড়ল। হাসিব খুব দ্রুত চেয়ারসুদ্ধ টেনে একে পাশের রুমে নিয়ে গেল। দুটি লাশ এখন সংরক্ষিত ফাইল পত্রের রুমে। দরজাটা বন্ধ করে সে অফিস থেকে বের হল।

বাইরে মুক্ত বাতাস। পুলিশের গাড়ি, পুলিশের লোক। হাসিব ভ্রুক্ষেপও না করে দ্রুত চলে গেল।

দশম অধ্যায়

সাইদুর রহমান ডাক্তার হারুনের রুম থেকে বের হবার কিছুক্ষণ পর জানতে পারলেন বিশেষ বাহিনীর সেই সদস্য হাসিব থানার একটি গোপন ভল্ট ভেঙ্গে দুজন পুলিশ হত্যা করে কিছু পুরনো ফাইল নিয়ে পালিয়ে গেছে। একটি জরুরী মিটিং আয়োজন করতে হল অফিসে। তা শেষ হতে হতে প্রায় নয়টা বেজে গেল। মিটিং এ সিদ্ধান্ত হল হাসিবকে দেখা মাত্র যেন গ্রেফতার করা হয়।

নয়টার পরে সাইদুর রহমান কয়েকজন পুলিশ সদস্যকে সাথে নিয়ে হাসপাতালের নার্স মৃণালিনী দেবীর বাসগৃহের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। মৃণালিনী দেবী একটা ছোট এপার্টমেন্টে থাকেন। গাড়িটা এপার্টমেন্টের সামনে রেখে সাইদুর রহমান ঠিকানা মিলিয়ে ঘরে প্রবেশ করতে গিয়ে দেখলেন দরজা খোলা।

তাও দুবার তিনি কলিংবেল টিপলেন। কোন উত্তর এলো না। শেষে দরজা হালকা ধাক্কা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন। সাজানো ড্রয়িং রুম। বেশ কয়েকটা বড় ফটোগ্রাফ ঝুলছে দেয়ালে।

সাইদুর রহমান ডাকলেন, "মৃণালিনী দেবী...মৃণালিনী দেবী..."

কোন সাড়াশব্দ এল না। সাইদুর রহমান পিস্তল বের করে ক্ষীপ্রতার সাথে এগিয়ে গেলেন। ড্রয়িং রুমের পরে আরেকটা ছোট রুম। সেখানে খাবার টেবিল। অগোছালো, মনে হচ্ছে একটু আগে কেউ খেয়েছে। দুটা প্লেটের একটাতে ডিমবাজি এবং কিছু ভাত। আরেকটাতে পুরোপুরি খাওয়া হয়েছে।

খাওয়ার রুমে বা দিকে একটা দরজা। এটা নিশ্চয়ই বেডরুম। দরজা হালকা ভেজানো। সাইদুর রহমান আস্তে করে দরজাটা খুললেন। এবং দেখতে পেলেন ভদ্রমহিলা মেঝেতে শুয়ে আছেন। তার পাশে একটা সক্রেটিসের মূর্তি। সেই মূর্তির সামনে ভদ্রমহিলার কাটা মাথা রাখা আছে। রক্তে কার্পেট ভেসে যাচ্ছে।

সাইদুর রহমান ভিতরে প্রবেশ করলেন। সাথে পুলিশ সদস্যরাও প্রবেশ করলো। সক্রেটিসের মূর্তির পাশে আরেকটি ব্রোঞ্জের তৈরী লকেট পড়েছিল। সাইদুর রহমানের খুব চেনা চেনা মনে হল। তিনি হাতে নিলেন। দুটি ঈগলের মাথা দুদিকে, পা, লেজ। মাথার উপরের মুকুটের মত অংশ। ঠিক মাঝামাঝি অংশে লাল বৃত্তের মধ্যে লেখা ইংরেজি টি এবং এস অক্ষর। এই দুই অক্ষরের দিকে তাকিয়েই সাইদুর রহমানের মনে পড়ল, এটি অর্ডার অব দি সোলার টেম্পলের প্রতীক। পৃথিবীর এক ভয়াবহ কাল্ট এই অর্ডার অব দি সোলার টেম্পল। নব্বই দশকের মাঝামাঝিতে এর উৎপত্তি জোসেফ ডি

মামব্রো এবং লাক জৌরেটের মাধ্যমে। পেশায় মামব্রো ছিল রত্নব্যবসায়ী আর জৌরেট হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে এমন ধারণা আছে। এই ধারণা এক অদ্ভুত উপায়ে ব্যবহার করেছিল এরা। তারা "পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে অতএব তুমি আত্মহত্যা কর" এরকম উদ্ভট কিছু মত প্রকাশ করেছিল।

লাক জৌরেট এবং মামব্রো মনে করত তারা মৃত নাইট টেম্পলারদের আত্মা। তারা অদ্ভুত অদ্ভুত সব কর্মকান্ড করতো। ১৯৯৪ এর অক্টোবরে কানাডার কুইবেকে কাল্টের সদস্য টনি এবং নিকি ডুটোইটের তিনমাসের শিশুপুত্র ক্রিস্টোফার ইম্মানুয়েলকে মামব্রোর নির্দেশে লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। মামব্রো মনে করত, এই শিশুটির জন্ম হয়েছে তার মিশন ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য।

এই কাল্ট অনেক মানুষকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছিল। জীবন শুধু মায়া, সত্যিকারের জীবন অন্য এক গ্রহে। মৃত্যু আন্তঃনাক্ষত্রিক ভ্রমণ ইত্যাদি মতবাদের মাধ্যমে মানুষকে তারা মৃত্যুতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। মানুষের আরো এক অদ্ভুত প্রাণী। সে বিশ্বাস করতে পছন্দ করে। তাই এই কাল্টেও সদস্য জুটেছিল অনেক। খ্যাতিমান সঙ্গীতপরিচালক মিচেল টাবার্থনিকও এদের সাথে গিয়ে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৯৪ থেকে '৯৭ এর মধ্যে বেশ কিছু আত্মহত্যা বা খুনের ঘটনা ঘটায় এরা। প্রার্থনাগৃহে আগুন দিয়ে, ছুরিকাঘাতে, বিষক্রিয়ায় ইত্যাদি নানাভাবে কাল্টের

সদস্যরা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে অথবা তাদের মতে আন্তঃনাক্ষত্রিক ভ্রমণে অংশ নিয়েছে।

ভয়ংকর ব্যাপার হল, এই নৃশংস কাল্ট এখনো পৃথিবীতে আছে এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার অজুহাতে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

সাইদুর রহমান বিচিত্র ধরনের অপরাধীদের নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। তাই এই কাল্ট সম্পর্কিত তথ্য তার জানা ছিল। কিন্তু তিনি ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি এদেশে এক নৃশংস মাথাকাটা লাশের পাশের এদের চিহ্নটা পাবেন।

টেবিলে খাবার দাবারের আয়োজন দেখে বুঝা যাচ্ছে খুনী ভিক্টিমের খুব পরিচিত ছিল। পরিচিত নাহলে ডিমবাজি করে একসাথে কেউ ভাত খায় না। সাইদুর রহমান লাশ কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন ধ্বস্তাধ্বস্তির কোন চিহ্ন নেই। কিন্তু এ কী করে সম্ভব!

কেউ মাথা কাটতে আসলে ধ্বস্তাধ্বস্তি তো কিছুটা হবেই। এছাড়া সাইদুর রহমান রক্তের ধারা থেকে বুঝলেন খুব বেশিক্ষণ আগে হত্যা করা হয়নি। কিন্তু শরীরে হাত দিয়ে মনে হল অনেকক্ষণ আগে থেকেই নিস্তেজ ছিল। নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে সাইদুর রহমান বুঝতে পারলেন ভিক্টিমকে খুন করার আগে সম্ভবত অজ্ঞান করা হয়েছে। প্রাচীনকালে বলি দেয়ার আগে যাকে বলি দেয়া হবে তাকে কড়া মাদক খাইয়ে প্রায় অজ্ঞান করে ফেলা হত। যাতে মৃত্যুযন্ত্রণা কম হয়।

মৃণালিণী দেবী দেখতে সুন্দর ছিলেন। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে জীবন্ত। মাথা দেহ বিচ্ছিন্ন হলেও মুখে এক ফোটাও রক্ত লেগে নেই। সাইদুর রহমান এতে বেশ অবাক হলেন। দেখে মনে হচ্ছে কেউ যত্ন করে মুখটা পরিষ্কার করে রেখে গেছে। একজন পুলিশ অফিসার ঘটনাস্থলের ছবি তুলছিল।

হঠাৎ লাশের বা পাশে কার্পেটের মধ্যে একটি কাগজ দুমড়ানো মুচরানো অবস্থায় দেখে সাইদুর রহমান তা তুলে নিলেন। সেখানে নীল কালিতে লেখা আছে-

"সেও তখন হাসছিলো
মহাশূন্যে ভাসছিলো
চোখের কাচে ঘুম পাতানো
প্রিয়জনের লাশ ছিলো"

সৌমিত্র দেব

টেবিলের পাশে মৃণালিনী দেবীর ডায়রীর মত খাতা একটা ছিল। তাতে বাজারের ফর্দ টাইপের কিছু লেখা। সাইদুর রহমান সাধারন চোখে মিলিয়ে দেখলেন দুটিই একই হাতের লেখা মনে হচ্ছে!

সাইদুর রহমান লাশ পর্যবেক্ষণ করে খাবার টেবিলে গেলেন। সেখানে একপাশে দুটি চায়ের কাপ পাওয়া গেল। অর্ধেক চা আছে। দুটি কাপই সে অবস্থায় পরীক্ষার জন্য থানায় নেয়া হল।

লাশ নেয়া হল পোস্টমর্টেমের জন্য। সাইদুর রহমান সবকিছু ঠিক করে দিয়ে সাংবাদিকেরা আসার আগেই বাসায় ফিরে গেলেন। অনেক হিসাব এমনিতেই মিলছে না। এর মধ্যে সাংবাদিকদের প্রশ্নবাণে পড়লে আর উপায় নেই।

সেদিন রাতে অদ্ভুতভাবে সাইদুর রহমান একটি ভিডিও কল পেলেন দার্শনিকদের কাছ থেকে। কম্পিউটারের পর্দায় কালো কাপড়ে মাথা ঢাকা লোকটিকে দেখে সাইদুর রহমান নিজেকে শক্ত করলেন। সক্রেটিসের শুধু মুখটাই দেখা যাচ্ছে।

সে গাঢ় স্বরে বলল, "শালামু"

সাইদুর রহমান ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মানে কি?"

"আক্কাদিয়ান ভাষায় বললাম "হ্যালো"। আপনি কেমন আছেন? শুনলাম আপনার বিশেষ বাহিনীর এক সদস্য নাকি ভল্ট ভেঙ্গে কিছু ফাইল নিয়ে পালিয়ে গেছে।"

"হ্যাঁ। এবং আমি বুঝতে পেরেছি এটা আপনাদের কাজ। মানুষকে সম্মোহিত করে ফেলা আপনাদের পক্ষে কঠিন কিছু না। পলোনিয়াসকে খুন করলেন কেন?"

"পলোনিয়াসকে আমরা খুন করিনি। সে আমাদের দলে ছিল। আমরা কখনোই তাকে খুন করতে পারি না। আমরা আজ আপনাকে ফোন দিয়েছি তার মৃত্যুতে আমাদের শোকসভা বিষয়ে কথা বলতে। যেহেতু আপনি

আমাদের দীর্ঘদিনের পরিচিত তাই চাচ্ছি শোকসভায় আপনিও উপস্থিত থাকুন। আপনি থাকতে চাইলে লোকেরা এসে যথাসময়ে আপনাকে নিয়ে যাবে।"

সাইদুর রহমান স্পষ্ট স্বরে বললেন, "না।"

"কেন? আপনি বোধহয় আমাদের উপর চটে আছেন? ভাবছেন আপনার বাহিনীর ওই সদস্যকে আমরা ব্যবহার করেছি? ভুল ভাবছেন। ওর সম্পর্কে আপনি কতটুকুই বা জানেন?"

"এর মানে কি?"

"মানে হাসিব ছেলেটার ইতিহাস খোঁজেন। অনেক কিছু পেয়ে যাবেন। সে কে এবং তার পরিবারের সদস্যের কি হয়েছিল। জানুন, ভালো করে জানুন।"

সাইদুর রহমান বললেন, "তার পরিবার সম্পর্কে আপনি জানলেন কীভাবে? এ থেকেই প্রমাণ হয় ছেলেটার উপর আপনাদের লক্ষ্য ছিল।"

সক্রেটিস গম্ভীর কণ্ঠে বলল, "কীভাবে জানতে পারলাম বললে বিশ্বাস করবেন না সাইদুর সাহেব। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস যখন তার বিচারকদের সামনে বলেছিলেন, তখন তারাও বিশ্বাস করেনি। তিনি যে ডাইমন অর্থাৎ অদৃশ্য আত্মার বাণী দ্বারা পরিচালিত হতেন, আমাকেও সেরকম ডাইমন নির্দেশ দেয়। আমার ডাইমনের কাছ থেকেই আমি শুনেছি ছেলেটার ব্যাপারে।"

কল কেটে দেয়া হল। সাইদুর রহমান কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই স্ক্রিণ থেকে সক্রেটিসের মুখ মুছে গেল। সেখানে এখন শোভা পাচ্ছে দার্শনিক সক্রেটিসের মূর্তি।

সাইদুর রহমান দ্রুত গোয়েন্দা বিভাগে ফোন দিলেন।

ওপাশ থেকে,

"জ্বী স্যার?"

"হাসিব নামে একটা ছেলে, আমাদের স্পেশাল ডিপার্টমেন্টে ছিল, ভল্ট ভেঙ্গে কী সব ফাইলপত্র নিয়ে গেছে। ওর সম্পর্কে কি কি তথ্য আছে?"

"স্যার কি ধরনের তথ্য?"

"ওর ব্যাকগ্রাউন্ড মানে ফ্যামিলি এইসব।"

"স্যার এসব তথ্য আমাদের কাছে নেই। পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের হেড অফিসে আছে। আপনি চাইলে ফাইল আমি আপনার বাসায় পৌছে দিচ্ছি।"

"হ্যাঁ। খুব দ্রুত পৌছে দাও। আর স্পেশাল ব্রাঞ্চের সিনিয়র অফিসার মুহিবকে সাথে আসতে বলো।"

"জ্বী স্যার। দ্রুত আমরা ফাইল সংগ্রহ করে আপনার বাসায় পৌছে দিচ্ছি।"

চিন্তায় সাইদুর রহমানের কপালে ভাঁজের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। সবকিছু ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হ্যান্ডেল করতে হবে শক্ত হাতে। যত যাই হোক, দার্শনিক খোলসের

সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান হবেই। এ ব্যাপারে সাইদুর রহমান কঠিনভাবে স্থির।

নাইন আননোন ম্যান এবং ব্রোঞ্জের মাথা নিয়ে খোঁজখবর নেবার দায়িত্ব যাকে দেয়া হয়েছিল তিনি মেজর রফিক। আর্মিতে আছেন। সাইদুর রহমানের দূর সম্পর্কের চাচাত ভাই। এসব নিয়ে তার আগ্রহ প্রচুর। তাই তাকে দায়িত্বটা দিয়েছিলেন সাইদুর রহমান। মেজর রফিক উচ্চতায় পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি। মাথায় সামান্য চুল, তার নাকটা একটু মোটা। দেখলেই মনে হয় টমেটোর কথা। টমেটোর সাথে তার চরিত্রেরও সামান্য মিল আছে। তিনি ঝামেলা পছন্দ করেন কিন্তু তার চেহারা নিরীহ গোছের। টমেটোও একইরকম, দেখতে সাদাসিধে হলেও সে ফল না সবজি হিসেবে গণ্য হবে তা নিয়ে রীতিমত সিরিয়াস আইনি সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল আমেরিকায়। আমেরিকান সুপ্রিম কোর্ট ১৮৯৩ সালে রুল করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, টমেটো ফল হিসেবে নয়, সবজি হিসেবেই বিবেচিত হবে।

মেজর রফিক বললেন, "এরকম একটি ব্রোঞ্জের মাথা আসলেই আছে। তবে এটি সত্যিকার কাজ করে কি না জানিনা। তবে এদেশে যে এসেছে এবং কিছু অদ্ভুত মানুষের হাতে পড়েছে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।"

সাইদুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন, "কি করে নিশ্চিত হলে?"

"এরকম একটি ব্রোঞ্জের করোটি বা মাথা মিয়ানমার থেকে পাচার হয়ে এদেশে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্ত দিয়ে মাস তিনেক আগে। পাচারকালে বর্ডারগার্ডের কাছে ধরা পড়েছিল সেটি। কিন্তু তারা রাখতে পারেনি। পাচারকারীরা ছিনিয়ে নেয়। দুজন সদস্য পায়ে গুলি খেয়ে এখনো চিকিৎসাধীন। আমি সরাসরি তাদের সাথে কথা বলেছি। এরা নিজচোখে এরকম একটি ব্রোঞ্জের মুখ দেখেছে বলেছে আমাকে।"

"কিন্তু তুমি বর্ডার গার্ডের নিউজটি পেলে কীভাবে?"

"আমার এক বন্ধু রাহাত তখন ঐ সেকশনের দায়িত্বে ছিল। যেদিন হামলাটা হয় সেদিন আমরা একসাথে গল্প করছিলাম। আমার সামনেই ও সংঘর্ষের খবরটি পায়। আমি তখন অত গুরুত্ব দেইনি। কিন্তু আপনি আমাকে নয়জন অপরিচিত মানবের গুপ্ত সংগঠন এবং ব্রোঞ্জের করোটির ব্যাপারে দায়িত্বটা দেয়ার পরপরই বিষয়টা মনে পড়ে। আমি হাসপাতালে গিয়ে অসুস্থ বিজিবি সদস্যদের সাথে কথাও বলে এসেছি।"

"ভেরী গুড। কিন্তু জিনিসটা কোথায় আছে কিছু আইডিয়া করতে পেরেছ?"

"তেমন আইডিয়া করতে পারিনি সরাসরি তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে। তবে আমার একজনকে সন্দেহ হয়।"

সাইদুর রহমান জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "কাকে?"

মেজর রফিক একটু ইতস্তত করে বললেন, "এই আপনার ওই উজান ফকিরকে।"

বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে সাইদুর রহমান বললেন, "কেন? তাকে সন্দেহ করার কি কোন কারণ হয়েছে?"

মেজর রফিক বললেন, "জ্বী ভাই। লোকটাকে আমার সবসময়ই সন্দেহজনক মনে হয়। তাছাড়া ওর লাল গাড়ি নিয়ে অদ্ভুত বিষয়টাকেও আমার মনে হয় ভাঁওতা।"

সাইদুর রহমান কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "কিন্তু তাকে সন্দেহ করার পক্ষে তো কোন কারণ থাকতে হবে, নাকি?"

"হ্যাঁ। একটা কারণের কথা এই মুহূর্তে মনে পড়েছে লোকটার সীমান্তে যাতায়াত আছে। তাকে ফলো করা হচ্ছে। লোকটা বেশ ধূর্ত।"

সাইদুর রহমানের চোখ উৎসাহে চকচক করে উঠল। মেজর রফিকের উজান ফকিরকে নিয়ে সন্দেহের কারণে না, অন্য এক চিন্তা তার মাথায় এসেছে। সাইদুর রহমান কোন মানুষ কোন কাজের যোগ্য তা খুব সহজে বুঝতে পারেন। এটা তার একটি অন্যতম ভালো বৈশিষ্ট্য। কারণ সঠিক জায়গায় সঠিক মানুষটিকে বসানোর বিষয়টাই সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং।

মেজর রফিককে এই কাজের দায়িত্ব দেয়ার ফলেই উজান ফকিরের নাম উঠে এসেছে। তা না হলে হয়তো

সাইদুর রহমানের মাথায় উজান ফকিরকে নিয়ে চিন্তাটা মাথাতেই আসত না।

সেদিনই উজান ফকিরকে থানাতে ডেকে আনা হল। উজান ফকিরের মুখে সাদা লম্বা দাঁড়ি, মাথাভর্তি একরাশ উষ্কখুষ্ক চুল। তার চোখ দুটির দৃষ্টি গভীর এবং নাক ভীষণ খাড়া।

উজান ফকিরকে তার রুমে নিয়ে আসা হলে সাইদুর রহমান বললেন, "বসুন ফকির সাহেব। আপনার কেমন চলছে?"

উজান ফকির সাইদুর রহমানের দিকে মোলায়েম ভঙ্গিতে হেসে বলল, "ভালো স্যার, ভেরী গুড।"

"গাড়িদের কি খবর?"

"ভেরী ব্যাড। আপনি দুই নাম্বারি করার পর গাড়ির সংখ্যা কইমা গেছে। অনেক পরিচিতদের দেখি না আর। অবশ্য এতে আপনার হাত আছে জানি আমি।"

সাইদুর রহমানকে এরকম সরাসরি কথা এই একটা লোকই বোধহয় নির্বিকারভাবে বলতে পারে।

সামনে চেয়ারে বসা উজান ফকিরের মুখের দিকে তাকিয়ে সাইদুর রহমান বললেন, "না ফকির সাহেব, আপনার ধারণা ভুল। আপনার গাড়িরা কমে যাওয়ার পিছনে আমার কোন হাত নেই।"

উজান ফকির হাসলো সামান্য। বলল, "কিন্তু আপনে কালা, হইলদা গাড়ি গুলারে রঙ দিয়া লাল বানাইয়া

আমারে বোকা বানাইবার চাইছেন। ভাবছেন আমি চিনতে পারুম না। গু কালারের হইলদা গাড়িরে গিয়া বলব, "হাউ আর ইউ?"

সাইদুর রহমান অপ্রস্তুতের হাসি হাসলেন।

তিনি বললেন, "কিন্তু আজ আমি আপনার কাছে একটা সাহায্য চাইব। আপনি তো শুনেছি দোয়া দিয়ে, ফুঃ দিয়ে অনেক সমাধান করে দেন। আমাকে একটা ব্রোঞ্জের মাথা বের করে দিতে হবে?"

উজান ফকিরের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

সে বলল, "মাথা কি কথা কয়?"

প্রায় আঁৎকে উঠলেন সাইদুর রহমান। বললেন, "আপনি জানেন এর কথা?"

উজান ফকির নির্বিকার ভাবে বলল, "হ। জানি। আমার বাপের নাম আছিল ভাসান ফকির। বাপের কাছে মাথা থাকত। মূর্তির মাথা। মরা মাইনষের মাথা। সেইগুলার লগে সে কথা কইত। আমি যেমনে গাড়ির লগে কথা কইলে আপনেরা বুঝেন না, বাপের ঐ মাথাগুলার লগে কওয়া কথাগুলাও আমি বুঝতাম না। যার সে সাধনা, সেই তার মর্ম বুঝে।"

সাইদুর রহমান হতাশ ভঙ্গিতে তাকালেন। তার একবার মনে হল এই লোকটাকে তিনি বেশী প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেন। এ হচ্ছে মাঝারি শ্রেণীর উন্মাদ।

উজান ফকির তার পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটা ছোট সাইজের মড়ার খুলি বের করে টেবিলে রেখে বলল, "এই

দেখেন স্যার, মাথা। বাপে পরলোকে যাইবার আগে দিয়া গেছে। আমি এর কথা বুঝি না। কন্টিন কথা কয়। আপনি একবার টেরাই দিবেন?"

উজান ফকির Continue কে উচ্চারণ করে কন্টিন।

সাইদুর রহমান বললেন, "এই মাথা না, ব্রোঞ্জ দিয়ে বানানো এক মাথার মূর্তি। ওটা আমার খুব দরকার।"

হঠাৎ করেই উজান ফকির গম্ভীর হয়ে গেল। তার মুখ থমথমে। সে চোখ সাইদুর রহমানের দিকে স্থির রেখে দৃঢ় কণ্ঠে বলল, "আছে! জিনিস আশে পাশেই আছে!"

তারপর ঝট করে উঠে পড়ল। "আছে! জিনিস আশে পাশেই আছে!" বাক্যটি ফিসফিস করতে করতে সে বেরিয়ে গেল। সাইদুর রহমান তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন একে বিষয়টা বলে ভালো করলেন না খারাপ করলেন? সাইদুর রহমান শুধুমাত্র যে উজান ফকিরের অলৌকিক ক্ষমতার উপর বিশ্বাস করে বলেছেন তা নয় অবশ্যই। অলৌকিক কোন কিছুতেই তিনি বিশ্বাস করে না। উজান ফকির লোকটা সারা শহর চষে বেড়ায়। গলি, তস্য গলিতে তার আনাগোনা। আর লোকটির চোখের দৃষ্টি মারাত্মক গভীর। সুতরাং তাকে এই আশায় তিনি বলেছেন যে, হয়তো সে কোথাও জিনিসটি দেখতে পারে।

একাদশ অধ্যায়

হাসিব মগ্ন হয়ে ডায়রিগুলো পড়তে শুরু করলো। ডায়রির সংখ্যা মোট তেরোটি। এর মধ্যে একটা বেশ বড়। একশত বিশ পেজ। বাকিগুলো খুব ছোট ছোট। শেষের দুটি অর্থাৎ তার বড় ভাইয়ের ছোট ছেলে মেয়ে যাদের বয়স তখন ছিল সম্ভবত সাত এবং আট, তাদের ডায়রিতে এক পাতা করে লেখা। বাচ্চাদের হাতের লেখা এবরোথেবরো। তারা লিখেছেঃ

"আমি আদমের অংশ।"

"আমার নাম মিতু। আমি মালেক তাউশের অনুসারি।"

"যারা আমাদের শত্রু তাদের তিনি দংশ করবেন।"

"আমি আদমের অংশ।"

"আমার নাম মিলু। আমি মালেক তাউশের অনুসারী। মালেক তাউশ আমাদের রক্কা করবেন।"

"আমাদের শতরুরা আমাদের খতি করছে। তারা আমাদের মেরে ফেলবে। মালেক তাউশ তাদের শাসতি দিবেন।"

বাইরে কালো অন্ধকার। রাত দুটোর মত। হারিকেনের আলোতে হাসিব শেষ ডায়রীটা পড়া শেষ করল। সে

এরকম কিছুই ভেবেছিল। এবং এর জন্য পুরোপুরি তৈরী হয়ে এসেছে। আজ বিকেলে কিছুক্ষণ বসেছিল তাদের সেই পুরনো বাড়ির জায়গাটাতে। সেখানে এখন খুব বড় বিল্ডিং হয়েছে। জায়গাটা চেনা যায় না। আগের সেই মাটির প্রাচীর ঘেরা বাড়ির কোন চিহ্নও নেই।

তার সাইলেন্সার লাগানো ন্যাগান্ট রিভলভারটাও প্রস্তুত। হাসিব পিস্তলটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর ডায়িরীগুলোতে হারিকেনের কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অন্ধকারে। এখন তার কাজ একটাই। এক কঠিন প্রতিশোধ নেয়া।

রাত চারটার মধ্যে পুরো গ্রাম জেগে উঠল কিছু আর্তনাদের ভেতর দিয়ে। গ্রামের চেয়ারম্যান হবিবুল্লা তরফদার, মুরুব্বী খোরশেদ মিয়া, আবদাল খান, জমির মুন্সী ও তার তিন ছেলে, রফিকুজ্জামান ও তার স্ত্রী, আবু শাহেদ ও তার দুই পুত্র খুন হয়েছেন। গভীর রাতে এক ভয়াবহ কালো বিভীষিকা তাদের ঘরে প্রবেশ করে গুলিতে খুন করে রেখে চলে গেছে। সবার মাথায় ঠিক কপালে গুলি করা হয়েছে।

আকস্মিক রক্তে ভিজে গেল কৈলাশপুর। যেখানে অনেক বছর আগে আব্দুল মজিদের পরিবার একসাথে আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছিল। ওই ঘটনার পরে এত জন মানুষ এই গ্রামে একসাথে আর মারা যায়নি। এবং এবারের মৃত্যু আরো ভয়ংকর।

স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসার মুহিব এবং সাইকোলজিস্ট দিবেন্দু ভট্টাচার্য বসে আছেন সাইদুর রহমানের ড্রয়িং রুমে। দিবেন্দু এই হাসিবের পরিবারের আগুনে আত্মহত্যার পরে বিষয়টি নিয়ে কিছু গবেষণা করেছিলেন। এ ব্যাপারে তার একটি গবেষণা প্রবন্ধ বিখ্যাত এক আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল।

সাইদুর রহমান হাসিবের কিছু ফাইলপত্র মনযোগ সহকারে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করলেন, "এই ছেলের বাবাই ছিল লোকটা?

অফিসার মুহিব বলল, "জ্বী স্যার। লোকটার নিজস্ব এক ধর্মমত, তারপর প্রতিবেশীদের সাথে বিরোধ অতঃপর সবার আত্মহত্যা - এটাই তাদের পরিবারের ঘটনা।"

সাইদুর রহমান সাইকোলজিস্ট দিবেন্দুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু এদের ব্যাপারটা কি ছিল ডাক্তার সাহেব?"

দিবেন্দু ভট্টাচার্য বললেন, এটাকে বলা যায় Folie a` famille মানে একধরনের এসপিডি অর্থাৎ শেয়ারড সাইকোটিক ডিজঅর্ডার। এটা আসলে খুব রেয়ার কন্ডিশন। যখন ফ্যামিলির সব সদস্য একটা ডিল্যুশন শেয়ার করে। সাধারণত দেখা যায় পরিবারের প্রধান সদস্যের মধ্যে প্রথম ডিল্যুশনটা শুরু হয় এবং তারপর পুরো পরিবারে বিস্তার লাভ করে। অনেক গবেষণা হয়েছে এ নিয়ে। গবেষকেরা বলেছেন এটি স্কিজোফ্রেনিয়ার একটা

অংশ, হতে পারে প্রাইমারী ডিল্যুশনাল ডিজঅর্ডার কিংবা হতে পারে কোন ধরনের মুড ডিজঅর্ডার। আমার ধারনা, এই ফ্যামিলির ক্ষেত্রে এটাই হয়েছিল। যেমনঃ ওদের যে ডায়রি বা সুইসাইড নোটগুলো আমি পড়েছিলাম তখন দেখেছি আব্দুল মজিদ লোকটা প্রায় প্রতিদিনই অদৃশ্য কার সাথে কথা বলত। কখনও উত্তেজিত হয়ে কখনও আপোষমূলক স্বরে। এগুলো তার মেয়েদের ডায়রীতে লেখা ছিল। তারা লিখেছিল তাদের বাবা আব্দুল মজিদ দুষ্ট জ্বীনের সাথে কথা বলতেন। এই ধরনের আচরণ হতে পারে অডিটরী হ্যালোসিনেশন বা ডিল্যুশনের অংশ। এবং পরবর্তীতে পুরো পরিবারের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে।"

সাইদুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন, "ডায়রী বা সুইসাইড নোটগুলোতে আর কিছু কি ছিল তা আপনার মনে হয়েছে খুব গুরুত্বপূর্ণ?"

দিবেন্দু ভট্টাচার্য বললেন, "তাদের বড় ভাই হাশিম একদিন রাতে বাজার থেকে বাড়ি ফিরতে গিয়ে মারা যায়। তারা একেও বলেছিল জ্বীনেরা তাকে মেরে ফেলেছে।"

"বড় ভাই তাহলে আগেই মারা গিয়েছিল?"

"হ্যাঁ। এরপর পুরো ফ্যামিলি প্রতিবেশীদের সাথে সংশ্লিষ্টতা পুরোপুরি ত্যাগ করে। যদি আগেও তাদের প্রতিবেশীদের সাথে সংশ্লিষ্টতা ছিল না। এ ব্যাপারেও লেখা আছে তাদের নোটগুলোতে। আব্দুল মজিদকে গ্রামের বাজারে একদিন অপদস্ত করা হয়, মারধর করা

হয়। কারণ সে আব্রাহামিক রিলিজিয়ন নিয়ে বেশ কিছু আপত্তিকর কথা বলেছিল। ফলশ্রুতিতে গ্রামে তাদের একঘরে করে রাখা হয়। আর তারাও নিজেদের ঘরের মধ্যেই আবদ্ধ করে রাখতো। বিশেষ করে বড় ভাই আব্দুল হাশিমের আকস্মিক মৃত্যুর পর।"

"তাদের ধর্মমত আসলে কি ছিল?"

"তা সঠিক বুঝা যায়নি। তারা মালেক তাউশের পূজা করত বলেই মনে হয়েছে।"

"মালেক তাউশ মানে ময়ূর ফেরেশতা? মানে সেই লুসিফার বা আজাজিল?"

"মালেক তাউশকে অনেকটা সেরকমই মনে করেন ইসলাম বা খ্রিস্ট ধর্মের স্কলাররা। প্রায় ১৬ শতক থেকে মুসলমানরা ইয়াজিদিদের বলে থাকেন শয়তানের উপাসক। তবে মালেক তাউশের ধারণা প্রাচীন মেসোপটেমিয়ান বা জথরুস্ত্রবাদ থেকে আগত। কুর্দিস্থানের ইয়াজিদিদের ধর্মমতে মালেক তাউশ হচ্ছেন সবচেয়ে বড় ফেরেশতা। তারা আবার এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে।

তাদের কথামতে, সৃষ্টিকর্তা মালেক তাউশকে বানিয়েছিলেন নিজের নূর দিয়ে এবং আদমকে নিজের নিঃশ্বাস থেকে। মালেক তাউশকে যখন বলা হল আদমকে সেজদা করার জন্য তখন সে বলল, "আমি সৃষ্টিকর্তার নূরের তৈরী, আল্লাহর নূর কীভাবে একজন মানুষকে সেজদা করতে পারে?"

এতে সৃষ্টিকর্তা খুশি হন। এবং তার সহযোগী হিসেবে নিযুক্ত করেন। ইয়াজিদিরা মালেক তাউশকে

ফেরেশতাদের নেতারূপে জ্ঞান করে। তাদের ধর্মপুস্তক হল মালেক তাউশের বানী সম্বলিত বই। নাম আল জিলওয়াহ এবং মেশাফ রেশ। তারা মনে করে শয়তান বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। ভালো বা মন্দ কাজের জন্য মানুষ নিজেই দায়ী।

তাদের নবীর নাম ছিল শেখ আদী ইবনে মুসাফির। তাকে ইয়াজিদিরা বলে মালেক তাউশের অবতার। শেখ আদী এই ধর্মকে নতুন জীবন দান করেছিলেন তার মাধ্যমে মালেক তাউশের পূনর্জন্ম হয়েছে এই ধারণা প্রচারের মাধ্যমে। তার মাজার এখন ইয়াজিদিদের প্রধান তীর্থস্থান। পৃথিবীতে প্রায় সাত আট লাখ লোক এই ধর্মে বিশ্বাস করে।"

সাইদুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে এই পরিবারের সবাই কি ইয়াজিদিদের মতে বিশ্বাসী ছিল?"

দিবেন্দু ভট্টাচার্য বললেন, "আমার মনে হয় না। কারণ ইয়াজিদিদের ধর্মে একসাথে আত্মহত্যার কোন বিধান নেই। তারা প্রতিদিন পাঁচবার প্রার্থনা করে, ঈশ্বরে বিশ্বাস করে।"

সাইদুর রহমান গম্ভীর হয়ে বললেন, "বুঝলাম। কিন্তু হতে পারে না এরা ইয়াজিদিদের ভিন্ন কোন ধারা?"

দিবেন্দু বললেন, "তা হতে পারে। এই সম্ভাবনার কথা আমিও ভেবেছি। কারণ ওদের প্রায় সবার ডায়রীতেই লেখা ছিল আমি আদমের অংশ। এটি বেশ ইন্টারেস্টিং। কারণ ইয়াজিদিরাও নিজেদের মনে করে কেবল আদমের সন্তান। হাওয়ার অংশ না তারা।"

শেষরাতের দিকে সাইদুর রহমান তার টেবিলে বসে সাইকোলজিস্ট দিবেন্দু ভট্টাচার্যের রিসার্চ পেপারটি পড়ছিলেন। তিনি কিছু অংশ লাল কালিতে মার্ক করেছেন, কখনও কম্পিউটারে সার্চ করে আব্দুল মজিদের পরিবারের মৃত্যু বিষয়ক তথ্যাদি দেখে নিচ্ছেন।

হঠাৎ কয়েকটা ব্যাপার তিনি মেলাতে শুরু করলেন।

আব্দুল মজিদ তার জীবনের মধ্য বয়স থেকেই গ্রামে একটু পাগলাটে লোক বলে পরিচিত ছিলো। লোকে তাকে ডাকত পাগলা পীর। তার নতুন ধর্মমত এবং সে সম্পর্কে মত প্রকাশের ফলে তাকে নাজেহাল করা হয়েছিল। এদেশে তা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এর পিছনেও কি অন্য কোন কারণ থাকতে পারে না? বিশেষ করে সেই আগুনে আত্মহত্যার ঘটনায়?

সাইদুর রহমান দেখলেন আব্দুল মজিদের বাড়িটি ছিল বেশ বড়। রেলওয়ের কাছে। এসব জমির দাম খুব বেশি হয়। সুতরাং, এমন কি হতে পারে না, কেউ এই জমি দখল করার জন্যই কেউ আগুন দিয়েছে আব্দুল মজিদের বাড়িতে?

আর তার বড় ছেলের মৃত্যুর ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। আব্দুল মজিদের কবর নিয়ে গ্রামের মুরুব্বীদের সাথে তার বিরোধ হয়েছিল। আব্দুল মজিদ বলে গিয়েছিল তাকে যেন জানাযা না দিয়ে, গোসল না দিয়ে, যে কাপড়ে মৃত্যুবরণ করেছে সেই কাপড়ে এবং মাথা পূর্বে, পা পশ্চিমে, মুখ দক্ষিণ দিকে দিয়ে ঘরের মধ্যে পুঁতে ফেলা হয়। তার বড় ছেলে আব্দুল মজিদের কথামত তাকে পুঁতে ফেলতে চাইলে গ্রামের সাথে তার বিরোধ বাঁধে। এটা কি

হতে পারে না এই বিরোধের জন্যই একরাতে বাজার থেকে ফেরার পথে আব্দুল হাশিমকে মেরে ফেলা হয়েছিল?

এবং তাদেরই পরিবারের ছেলে হাসিবের ভল্ট ভেঙ্গে এই ফাইলগুলো নেবার পিছনে কী কারণ থাকতে পারে? সে কী জানতে চায় তার পরিবারের সদস্যেরা কি লিখে গেছে? তা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু তার পরিবারের সদস্যরা তো দুষ্ট জ্বীনের এজেন্ট বলে কিছু প্রতিবেশীদের নাম লিখে রেখে গিয়েছিল, যারা তাদের ক্ষতি করেছে। খুব সম্ভবত তাদের আগুনে আত্মহত্যার পিছনেও এই প্রতিবেশিরাই জড়িত।

এই প্রতিবেশিরা কারা? এদের বিরুদ্ধে কি কোন তদন্ত হয়েছে? কোন তদন্ত কী হয়েছে একই পরিবারের এতজন সদস্য আগুনে পুড়ে মরে যাওয়ার ঘটনা নিয়ে?

হয়নি।'

নির্ঘুম চোখে সাইদুর রহমান এসব ভাবছিলেন। ঠিক তখনি তিনি একটি ফোন পেলেন পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে যা তার ভাবনার সত্যতাই প্রমাণ করল। ফোনে বলা হল, " কৈলাশপুর গ্রামে বারো জন খুন হয়েছেন। এদের শরীরে পাওয়া গেছে স্বয়ং বিশেষ বাহিনীর জন্য প্রস্তুতকৃত গুলি।"

দ্বাদশ অধ্যায়

পরদিন অফিসে গিয়ে সাইদুর রহমান মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর ব্যাপারে আপডেট জানতে পারলেন। কিছু তদন্তে বেরিয়ে এসেছে ডাক্তার হারুনের সাথে তার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সুতরাং ডাক্তার হারুণকে জিজ্ঞেস করলে মৃণালিনীর খুনের ব্যাপারে হয়তো কিছু জানা যাবে।

একটি ইমেল পেলেন ডিপার্টমেন্টের হাই কমান্ড থেকে। "আপাতত দার্শনিক নামের কোন গুপ্ত সন্ত্রাসীদলের বিরুদ্ধে কোন অভিযান চালনা করা হবে না। আগে তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে ডিপার্টমেন্ট নিশ্চিত হতে চায়।"

সাইদুর রহমান সকাল দশটার দিকে গেলেন চৌধুরী মেমোরিয়াল হাসপাতালে। এখানকার সবাইকে ঠিকমত জানতে হবে। হাসপাতালের মালিক একজন বড় ব্যবসায়ী। সেই ভদ্রলোকও এসেছেন। বেশ আন্তরিকভাবে তিনি সাইদুর রহমানকে স্বাগত জানালেন।

ভদ্রলোকের নাম ইশতিয়াক আহমেদ। তিনি দেখতে ভুঁড়িওয়ালা এবং কথা বলেন খুব বেশি। সাইদুর রহমানকে বললেন, "স্যার, আমার হাসপাতালের রেপুটেশনটা আপনি একবার দেখেন। সেই উনিশশো বিরানব্বই সালে করেছিলাম। কিন্তু এই এত বছরে কখনও কোনো ঝামেলা হয় নাই। এই বছরই প্রথম। তাও দুই দুইটা আত্মহত্যা।

তারপর এই গতরাতের ঘটনা। মেয়েটাকে আমি দেখেছি। খুব ভালো ছিল।"

সাইদুর রহমান আশ্বস্ত কণ্ঠে বললেন, "এই আত্মহত্যা বা হত্যাগুলো আবার খুব ইন্টারেস্টিং। তবে সমস্যা নেই। আশা করা যায় এগুলোর পিছনের সত্য জানা যাবে। আমি সবার সাথে আলাপ করতে চাই। সবাই মানে ডাক্তার নার্স যারা যারা আছেন।"

ইশতিয়াক আহমেদ বললেন, "সবাইকে কি হলরুমে ডাকব?"

সাইদুর রহমান বললেন, "না। তার আর দরকার হবে না। আমি তাদের রুমে গিয়েই কথা বলব। তবে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব।"

ইশতিয়াক আহমেদ একটু ঢোক গিলে বললেন, "করুন প্লিজ।"

সাইদুর রহমান তার স্বাভাবিক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন, "যেদিন লেখক আফসার উদ্দিন মারা যান এখানে, সেদিন আপনি কোথায় ছিলেন?"

ইশতিয়াক আহমেদ মুখ উজ্জ্বল করে বললেন, "সেদিন আমি লন্ডনে ছিলাম। ভাইয়ের বাসায়। আমার কাছে প্রমাণ..."

সাইদুর রহমান তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "তার আর দরকার হবে না।"

সেদিন হাসপাতালের ডাক্তার নার্স এবং অন্য যেসব কর্মচারী ছিল তাদের সবার সাথেই কথা বললেন সাইদুর

রহমান। তিনটা ছেলে ডাক্তারদের চা টা আনা নেয়া, ছোটখাট কাজ ইত্যাদি করার জন্য নিয়োজিত ছিল। তাদের একজনকে একটা প্রশ্ন করে তার উত্তর শুনে সাইদুর রহমানের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অন্যদের কাছ থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে তাকে কিছু কথা বললেন সাইদুর রহমান।

ঘন্টা খানেকের মধ্যে সবাইকে জেরা শেষ করলেন সাইদুর রহমান। কিছু সাংবাদিক জড়ো হয়েছিলেন। তাদের একজনের প্রশ্নের উত্তরে সাইদুর রহমান জানালেন, "আপাতত মনে হচ্ছে এই হাসপাতালে হওয়া আত্মহত্যা দুটি খুব সম্ভবত খুন নয় । এগুলোর সাথে গতকালের হত্যাকান্ডের হয়তো কোন সম্পর্ক নেই ।"

পুরো হাসপাতাল জুড়ে থমথমে পরিস্থিতি নেমে এসেছিল। সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। ইশতিয়াক আহমেদ বেশ খুশি হলেন। তিনি নিজের প্রতিষ্ঠানের সুনাম করে যাচ্ছিলেন অনবরত।

কয়েকজন ডাক্তার সেদিন হাসপাতালে আসেননি। ডাক্তার হারুণও ছিলেন না। তাই সাইদুর রহমান সরাসরি চলে গেলেন তার বাসায়। ডাক্তার হারুণকে নার্স মৃণালিনী হত্যাকান্ডের পর থেকে নিরাপত্তা দিচ্ছিল পুলিশের কিছু সদস্য।

ডাক্তার হারুণের বাসায় বসে সাইদুর রহমান মৃণালিনী দেবীর খুন নিয়ে তাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করা শুরু করলেন।

ডাক্তার হারুণ প্রসন্ন মুখেই উত্তর দিচ্ছিলেন। সাইদুর রহমানের সাথে ছিল স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসার মুহিব। সে বেশ অবাক হয়ে দেখল প্রশ্ন করতে করতে সাইদুর রহমান একের পর এক সিগারেট শেষ করছেন।

সাইদুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন, " তা আপনার সাথে মৃণালিনী দেবীর সম্পর্ক ছিল, এটা কি সত্যি?"

"জ্বী, আংশিক সত্যি।"

"আংশিক মানে কীরকম?"

"মানে একসময় খুব ভালো ছিল। কিন্তু ওর মৃত্যু কিছুদিন আগেই ওসব শেষ হয়ে যায়।"

"আচ্ছা, কেন?"

"সে অনেক কথা। আসলে আমাদের কিছু ব্যাপার নিয়ে সমস্যা হচ্ছিল।"

"সেসব ব্যাপার কি বলা যাবে?"

" হ্যাঁ। অবশ্যই। আসলে ওর বেশ কিছু বিশ্বাস ছিল, বেশ কিছু কার্যকলাপ ছিল। যার সাথে আমি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিলাম না।"

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সাইদুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন, " কি ধরনের বিশ্বাস ও কার্যকলাপ?"

"সব আমি জানি না। তার দেশ বিদেশের অনেকের সাথে পরিচয় ছিল।"

ডাক্তার হারুণ উত্তেজনায় খুব দ্রুত সিগারেট টানছেন। তিনি তিনটি ইতিমধ্যে শেষ করে ফেলেছেন।

"কি ধরনের পরিচয়? কীভাবে?"

"মানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। আসলে এসব ব্যাপার নিয়েই আমাদের ঝামেলাটা হয়। তারপর ওর মৃত্যুর পর তো বিষয়টা দেখাই গেল। সম্ভবত কোন ভয়ংকর ধর্মীয় গোষ্ঠির সাথে ওর সংযোগ ছিল। আমি এরকম দুটি লোককে ওর বাসায় একবার দেখেছিলাম। লোকগুলো কালো কাপড়ে ঢাকা ছিল। এর চেয়ে বেশি কিছু আমি জানি না।"

প্রায় ঘন্টাখানেক বসে সাইদুর রহমান ডাক্তার হারুণের সাথে ইতস্তত বিভিন্ন কথা বললেন মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু নিয়ে। এই সময়ে চা হল দুইবার, সিগারেট দুজনে মিলিয়ে প্রায় দশটা শেষ।

সাইদুর রহমান উঠতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এবার একটু অন্যপ্রসঙ্গে যাই, আপনার টেবিলে সেদিন একটা বই দেখলাম- আফটার দ্য কোয়াক। তার মানে আমি ধরে নিতে পারি আপনি অনেক বই পড়েন?

ডাক্তার হারুণ চোখমুখ উজ্জ্বল করে বললেন, "শখ বা অবসর বিনোদন এটাই আমার। অনেক পড়া হয়েছে। বিশেষ করে মুরাকামি বা সুররিয়ালিস্টিক লিটারেচারের আমি খুব বড় একজন ফ্যান বলা যায়।"

সাইদুর রহমান বললেন, 'তাহলে আপনার কালেকশনটা একবার ঘুরে দেখতে হয়। সুরিরিয়ালিজমের ব্যাপারে আমারো অনেক আগ্রহ আছে। এই জটিল

জীবনের নাগপাশ থেকে বাঁচতে কিছুটা পরাবাস্তবতা, কিছুটা যাদুবাস্তবতার দরকার আছে। কোথায় আপনার কালেকশন?"

সাইদুর রহমান উঠে দাঁড়ালেন। ডাক্তার হারুণকে প্রথমে কিছুটা বিব্রত মনে হল। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "চলুন তাহলে।"

সাইদুর রহমানকে নিয়ে গেলেন তার পড়ার রুমে। আসলেই অনেক বইয়ের সংগ্রহ সেখানে। বইপ্রেমীদের চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার মত। সাইদুর রহমান ঘুরে ঘুরে সব তাক দেখলেন। কয়েকটা বই নেড়েচেড়ে দেখলেন।

বই দেখা ও কথাবার্তা শেষ করে ডাক্তার হারুণের বাসা থেকে বের হতে হতে সাইদুর রহমান অফিসার মুহিবকে জিজ্ঞেস করলেন, "পলোনিয়াস পোস্টমর্টেম রিপোর্টে তার দেহে আঘাতের কোন চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল?"

মুহিব বলল, "না স্যার। আঘাত বা ধ্বস্তাধ্বস্তির কোন চিহ্ন ছিল না।"

সাইদুর রহমান গম্ভীর হয়ে গেলেন। আর কিছু বললেন না।

সেদিন সন্ধ্যায় ডাক্তার হারুণকে ধরে নিয়ে গেল বিশেষ বাহিনী সাইদুর রহমানের নির্দেশে।

সাইদুর রহমান সেদিন হাই তুলতে তুলতে বলেছিলেন, "খুব সম্ভবত তিনটা খুনই এই লোক করেছে। একে ধরলেই পিছনে কে আছে জানা যাবে।"

অফিসার মুহিব জিজ্ঞেস করেছিল, "কিন্তু স্যার কীভাবে?"

সাইদুর রহমান বিরক্তমুখে জবাব দিয়েছিলেন, মৃণালিনী দেবীর খাবার টেবিলে চায়ের কাপের সিগারেটের শেষাংশ ভাসছিল। হাসপাতালের চা আনা নেয়ার কাজে নিয়োজিত ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সেও বলেছে ডাক্তার হারুণ সবসময় চায়ের কাপেই সিগারেটের শেষাংশ ফেলে। আর তার লাইভ শো তো আজ দেখলে, যখন ওর বাসায় আমি কথা বলছিলাম। দ্বিতীয়ত হ্যান্ড রাইটিং এক্স্পার্টরা জানিয়েছেন যেসব কাগজে কবিতা লেখা ছিল ওগুলো ভিকটিমের লেখা না। ভিকটিমদের লেখার সাথে সিংহভাগ মিল থাকলেও অতি সূক্ষ্ম কিছু অমিলও আছে। হারুণের স্কুল জীবনের কিছু তথ্য ঘেটে দেখেছি, অন্যের লেখা দেখে প্রায় হুবহু লিখে ফেলতে সে পারদর্শী। অর্থাৎ হ্যান্ড রাইটিং ফ্রোজারিতে এক্সপার্ট। প্রথমে হয়তো খুব বেশী ভালো ছিল না। কিন্তু আস্তে আস্তে চর্চার ফলে তার এই ক্ষমতা আয়ত্ত্ব হয়ে গেছে। তার লাইব্রেরীতে এ নিয়ে দুষ্প্রাপ্য কিছু বইও আছে। "

অফিসার মুহিবের মনে পড়ল কথা বলার সময় ডাক্তার হারুণ চায়ের কাপেই সিগারেটের শেষাংশ ফেলছিল।

সে জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু স্যার, পলোনিয়াস বা লেখকের গায়ে কোন আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি?"

সাইদুর রহমান বললেন, "ওকে এনে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করব, সব বের হয়ে আসবে। আর ভুলে যাও কেন, সে ডাক্তার। চিহ্ন না রেখে মারার পদ্ধতি তার চেয়ে

ভালো কে জানবে। কোথায় যেন পড়েছিলাম,মেডুলা আর ফার্স্ট ভার্টেব্রার মাঝখানে সুঁই ফুটালেও মানুষ মারা যায়।"

অফিসার মুহিবের বিব্রত মুখ দেখে সাইদুর রহমান বললেন, "আরো কিছু জানতে চাও?"

মুহিব আগ্রহী দৃষ্টিতে বলল, "বলুন স্যার।"

সাইদুর রহমান বললেন, " প্রথম খুন অর্থাৎ লেখক খুনের পর যে কবিতাটা পাওয়া যায় ওটা ছিল ওই সিগনেচার এসপেক্ট মানে অপরাধ করার পর অপরাধী যেসব অদ্ভুত কিছু কাজ করে যায়। কিন্তু এর পরের খুনগুলোর ক্ষেত্রে কবিতাগুলো ফেলা হয়েছে সচেতনভাবেই। অর্থাৎ ঘটনা সাজাতে বা আরেকটু জটিল করে তুলতে। পলোনিয়াস খুনের পর যে লেখাটি পাওয়া গিয়েছিল তা ছিল শক্তির তিনটি কবিতা থেকে নেয়া। তিনটি কবিতা থেকে লাইন নিয়ে হুট করে লেখা সহজ কাজ না। বেশ চিন্তা করে, সময় নিয়েই কাজটি করা হয়েছে। আর বাকিটা ধরে আনলেই বলবো। যাও।"

ডাক্তার হারুণকে ধরে আনা হল। সাইদুর রহমান চলে গেলেন লেখক আফসার উদ্দিনের স্ত্রীর বাবার বাসায়। সেই মেয়েটাকে দেখে তার খুব মায়া হল। অপরাধীদের দেখে মায়া হওয়া ঠিক কি না সাইদুর রহমান জানেন না। মেয়েটিকেও থানায় আনা হল।

ডাক্তার হারুণ এবং লেখকের স্ত্রী একপাশে বসেছেন টেবিলের। অন্যপাশে সাইদুর রহমান।

তিনি লেখকের স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, "বইটা কোথায়?"

মেয়েটি কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, "আমি জানি না। সত্যি বলছি, আমি জানিনা। আমি খুনের সাথেও যুক্ত না। আমি এদের ভুল কথায় পা দিয়েছি।"

সাইদুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন, " তাহলে বলেন আর কে কে যুক্ত?"

"প্রকাশক তরিক আলী। সেই সমস্ত কিছু প্ল্যান করে। বইটা হাতিয়ে নিয়ে বিদেশে বিক্রি করার প্ল্যান তারই ছিল।"

তরিক আলী বেশ ক্ষমতাধর লোক। দেশের বেশ বড় কিছু রাজনৈতিক নেতার সাথে তার সুসম্পর্ক আছে। তবুও তরিক আলীকে ধরে আনা হল।

সে তার ভুঁড়ি দুলিয়ে দুলিয়ে বলল, "দেখুন স্যার, যা বলি শোনেন, বই নিবার ইচ্ছা আমার ছিল। কিন্তু তারে মারি নাই আমি। বইও পাই নাই। হুদাই টাইম লস। পুরা লস প্রজেক্ট।"

তরিক আলী প্রথমে বইটি কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু লেখক রাজী হননি। লেখকের পরিচিতদের সংখ্যা ছিল খুব কম। সুতরাং চুরি বা অন্যভাবে হাতিয়ে নিলে সরাসরি দোষটা পড়তো তার ঘাড়ে। লেখক এই বইটি নিয়ে খুব সতর্ক ছিলেন। ফলে সে এই বুদ্ধি করে যে তাকে মানসিকভাবে অসুস্থ করে বইটি নেয়ার। লেখক আরো দু'বার একই ধরণের ভয় পেয়ে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। সুতরাং, এই প্ল্যানমত কাজ

হলে তাকে সন্দেহ করার কোন উপায় থাকবে না। তাই সে লেখকের স্ত্রীকে হাত করে সুকৌশলে লেখককে অসুস্থ করার চেষ্টা চালায়। সব কাজ ঠিকমত হয়েছিল। কিন্তু বইটা পাওয়া যায়নি। লেখকের ব্যাগে বইটা ছিল না। তার ভাঙ্গা বাড়ি খুঁজেও বই পাওয়া যায়নি। এর মাঝে হঠাৎ করেই লেখক তৃতীয় দিনে সুস্থ হয়ে যান এবং কোথাও কোন চক্রান্ত হচ্ছে তিনি বুঝতে পারেন। তাই তাকে মেরে ফেলতে হয়।

পলোনিয়াসের ক্ষেত্রে ধারণা করা হয়েছিল বইটি তার কাছে আছে। সে স্বীকার করেনি। উপরন্তু পুলিশের কাছে যদি সব বলে দেয় সে ভয় ছিল। আর তখন দার্শনিক নামে এক গুপ্ত সংগঠনের কথা খুব প্রচার হচ্ছে। সুতরাং তাকে খুন করা হল যাতে দার্শনিকদের উপর সন্দেহ আরো ঘণীভূত হয় এবং নিজেরাও পুলিশের কাছে ধরা পড়ার ঝুঁকি থেকে বেঁচে যায়। তাই খুনের পর পলোনিয়াসের কক্ষে সক্রেটিসের মাথার মূর্তি রেখে দেয়া হয়েছিল। ব্যাপারটা অবশ্য সাইদুর রহমানকে তখন বেশ বিভ্রান্ত করতে পেরেছিল।

তৃতীয় খুন মৃণালিনী হত্যাও এই ঘটনার সাথে যুক্ত। পলোনিয়াস এবং আফসার উদ্দিন হত্যায় মৃণালিনী ডাক্তার হারুণের সাথে ছিলেন। ডাক্তার হারুণের সাথে তার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু শেষ দিকে যখন হারুণের মনে হল পুলিশ কিছুটা তাদের সন্দেহ করতে শুরু করেছে তখন

ডাক্তার হারুণের ভয় হয় মৃণালিনী যদি সব বলে দেয়। মৃণালিনীর সাথে তার বেশ সমস্যা হচ্ছিল। তারা দুজন দুই ধর্মের এবং ডাক্তার হারুণের সম্পর্কটা পরিণতি দেয়ার কোন ইচ্ছা ছিলো না। কিন্তু মৃণালিনী সত্যিই তাকে ভালবেসেছিল এবং তাকে বিয়ে করার জন্য চাপ প্রয়োগ করছিল। ডাক্তার হারুণ তাই চাইল মৃণালিনীকে সরিয়ে দিয়ে সব ঝামেলা শেষ করে দিতে। সে মৃণালিনীকে খুন করলো, এক ভয়ানক কাল্টের সাথে মৃণালিনীর সংশ্লিষ্টতার গল্প সাজাল। একে বিশ্বাসযোগ্য করতে মৃণালিনীর মাথা কেটে সক্রেটিস এবং অর্ডার অব দি সোলার টেম্পলের প্রতীক রেখে দিল। এক্ষেত্রেও প্রথমে সাইদুর রহমান কিছুটা বিভ্রান্তিতে পড়ে যান। কিন্তু পরে যখন বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করছিলেন তখন তার মনে পড়ে অপরাধ বিজ্ঞানের *The Staging of Crime Scene* এর কথা। অপরাধী শনাক্তকরণ তথা তদন্ত প্রক্রিয়ায় এই অংশটি সবসময় মাথায় রেখে কাজ করতে হয়। অপরাধীরা ঘটনাস্থল সাজিয়ে পুলিশের বা তদন্তকারীর দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করে।

সাইদুর রহমানের সন্দেহ হয় কারণ পত্রিকাগুলো যত যাই লিখুক তিনি জানেন দার্শনিকেরা কোন ধর্মীয় গোষ্ঠী না এবং সক্রেটিস তাদের দেবতাও নন। মূলত সক্রেটিসের মূর্তি থেকেই তার সন্দেহের শুরু। এরপর তিনি নিজেকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেনঃ

অর্ডার অব দি সোলার টেম্পলের আর কোন সদস্য পাওয়া গেল না কেন?

যেদিন মৃণালিনী খুন হন, সেদিন আরেকজন তার সাথে রাতের খাবার খেয়েছিলেন, তিনি কে?

মৃণালিনী যদি অর্ডার অব দি সোলার টেম্পলের সাথে যুক্ত থাকেন, তাহলে তিনি কীভাবে তাদের সাথে যোগাযোগ করতেন?

গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের সাথে অর্ডার অব দি সোলার টেম্পলের কি সম্পর্ক?

মৃত্যুর আগে সব ভিকটিমই কবিতা লিখে গেল কেন?

তিনি মৃণালিনীর ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়া শুরু করেন। মৃণালিনী ইন্টারনেট ব্যবহারে তেমন পারদর্শী ছিলেন না। তার বাসায় কোন কম্পিউটার, ল্যাপটপ, নোটবুক ইত্যাদি ছিল না। বিদেশের কারো সাথে তার যোগাযোগের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

অনেক খোঁজাখোঁজি ও বইপত্র পড়েও গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের সাথে অর্ডার অব দি সোলার টেম্পলের কোন সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়নি। তখন সাইদুর রহমান নিশ্চিত হন অপরাধী ঘটনাস্থল সাজিয়েছে। কে হতে পারে সেই অপরাধী? সাইদুর রহমানের প্রাথমিক সন্দেহের লিস্টে দার্শনিকেরা ছিলো প্রথমে, আর দ্বিতীয় অবস্থানে ছিলেন ডাক্তার হারুণ। অপরাধী হিসেবে ডাক্তার হারুণের প্রশংসা

করতেই হয়। তিনি খুনকে বিভৎস করে সাইদুর রহমানের মত অভিজ্ঞ ব্যক্তির নার্ভকে দূর্বল করে দিতে পেরেছিলেন।

সাইদুর রহমান প্রথমে এই খুনের ব্যাপারে দার্শনিকদের বেশি সন্দেহ করেছিলেন। ফলে অন্য অনেক কিছু তার নজরে পড়েনি। এটি তার বড় ধরনের ভুল ছিলো। তিনি উপন্যাস বা ফিল্মের কোন গোয়েন্দা হলে এ ধরনের ভুল করতেন না নিশ্চিত। কিন্তু পরবর্তীতে হাসপাতালে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় তিনি ডাক্তার হারুণের একটি অভ্যাসের কথা জানতে পারেন। তিনি সিগারেট খেয়ে চায়ের কাপে সিগারেটের শেষাংশ ফেলেন সবসময়। মৃণালিনী দেবীর ঘরে যে দুটো চায়ের কাপ পাওয়া গিয়েছিল তাদের একটিতে পাওয়া গিয়েছিল সিগারেটের শেষাংশ। তখন ডাক্তার হারুণের উপর সাইদুর রহমানের সন্দেহ গাঢ় হয়। তিনি ঘটনাস্থলের ছবি দেখতে দেখতে খুঁজতে থাকেন কোন কিছু থেকে হারুণের সংশ্লিষ্টতা বুঝা যায় কি না। একসময় মৃণালিনী দেবীর মুখের ছবি দেখার সময় লক্ষ্য করেন মুখটি পরিষ্কার। কোন রক্ত লাগানো নেই। ব্যাপারটা তিনি আগেও দেখেছিলেন। কিন্তু এবার এটি ভিন্ন অর্থ নিয়ে ধরা দিল। মুখটি যেন কেউ ভেজা তোয়ালে দিয়ে মুছে রেখে গেছে। তা নাহলে সামান্য রক্তও লেগে থাকত। অপরাধ সংগঠনকালে অপরাধী কিছু অস্বাভাবিক আচরণ করে থাকে। একে বলে পার্সোনেশন বা সিগনেচার **এসপেক্টস**।

আনডুয়িং হল তেমনি এক অর্থপূর্ণ পার্সোনেশনের অস্পষ্ট রূপ। খুব ভালোভাবে লক্ষ্য না করলে তা ধরা যায় না। সাধারণত ভিক্টিম যদি অপরাধীর নিকটাত্মীয় বা ঘনিষ্ট কেউ হয় তাহলে খুনের পর অপরাধী অবচেতনে অনুশোচনায় ভুগতে পারে। তখন সে কিছু বাহুল্য আচরণ দ্বারা সে অনুশোচনা প্রকাশ করে। যেমন, এই ক্ষেত্রে মৃণালিনী দেবীর কাটা মাথার মুখে লাগা রক্ত কেউ মুছে দিয়েছে। সুতরাং ডাক্তার হারুণের প্রতি সন্দেহ আরো দৃঢ় হয়।

সাইদুর রহমান এরপর ভাবতে বসেন ডাক্তার হারুণের মোটিভ নিয়ে। তার মোটিভ কি হতে পারে?

এক, মৃণালিনীর সাথে তার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। এখন মৃণালিনী বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছেন। ভিন্ন ধর্মের মেয়ে তিনি বিয়ে করবেন না, সমাজ বা পরিবার মেনে নেবে না এবং তার প্রেম আসলে সত্যিকার প্রেম ছিল না, সুতরাং মৃণালিনী খুন হলে তার অনেক ঝামেলাই শেষ হয়ে যায়।

দুই, হয়তো আফসার উদ্দিন এবং পলোনিয়াস হত্যার সাথেও ডাক্তার হারুণ জড়িত। হয়তো মৃণালিনী এবং হারুণ একসাথেই দুটি খুন করেছিলেন। এখন মৃণালিনী পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে সব বলে দিতে পারে এই ভয়েই তাকে খুন করা হয়েছে।

তিন, অন্য কোন কারণ।

দ্বিতীয় মোটিভের ব্যাপারটা মাথায় আসতেই সাইদুর রহমানের আরেকটি ব্যাপার নিয়েও সন্দেহ করলেন।

লেখকের স্ত্রী বলেছিলেন লেখকের প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিকদের ব্যাপারে দূর্বলতা ছিল। এমনকী তার শোবার ঘরেও সক্রেটিস ও প্লেটোর মূর্তি ছিল। সাইদুর রহমান লেখকের প্রকাশিত আঠারোটি উপন্যাস ভালভাবে পর্যালোচনা করে দেখেছিলেন আগেই। তিনি দেখতে পান যে ভদ্রলোকের কোন লেখাতেই প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিকদের নিয়ে একলাইনও নেই। সাধারণত লেখকদের যেসব বিষয়ে ভালোলাগা থাকে সেসব বিষয় তার লেখায় কোন না কোনভাবে উঠে আসে। কিন্তু আফসার উদ্দিনের ক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিকেরা উঠে আসেননি। সুতরাং, এ ব্যাপারে তার দূর্বলতা থাকার তথ্যটি ভুয়া। সাইদুর রহমান ভেবে দেখলেন সক্রেটিস এবং দার্শনিকদের সংগঠন নিয়ে ভুয়া কিছু গল্প কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পরই লেখকের স্ত্রী এই তথ্য দিতে এসেছিলেন। অপরাধীরা অবশ্যই কিছু ভুল করে- ছোট কিংবা বড়। এবং সেসব ভুল গুলো ধরতে পারলেই তারা ধরা সম্ভব হয়।

লেখকের স্ত্রীর এই মিথ্যা তথ্য দেয়ার অর্থ তিনি কোনভাবে এই মৃত্যুর সাথে জড়িত তাই তিনি বুঝাতে চান লেখকের দার্শনিকদের সাথে সংশ্লিষ্টতা- সাইদুর রহমান এভাবেই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ডাক্তার হারুণের বাসায় গিয়ে কথা বলতে বলতে তার সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারে নিশ্চিত হবার পর তিনি এ ব্যাপারে আরো নিশ্চিত হন যে দার্শনিকেরা এতে জড়িত নয়, লেখকের স্ত্রীর সংশ্লিষ্টতা

আছে। ডাক্তার গোপাল চন্দ্র বলেছিলেন, স্কিজোফ্রেনিয়া রোগী মরা জীব জন্তু বিছানায় এনে লুকিয়ে রাখে না। সুতরাং, সাইদুর রহমান ধরে নিলেন এটি সাজানো।

এভাবেই মূলত অপরাধীরা শনাক্ত হল।

অপরাধী তিনজনকে যদিও ধরা হল কিন্তু অনেকভাবে প্রশ্ন করেও বইয়ের ব্যাপারে কিছু জানা গেল না তিনজনের কাছ থেকে। বইটা সত্যি সত্যিই তাদের হাতে যায়নি। মাঝখান থেকে নিয়ে গেছে অন্য কেউ।

তবে লেখক, পলোনিয়াস এবং নার্স মৃণালিনীর খুনের একটা মীমাংসা হয়েছে। এতেই আপাতত খুশি হলেন সাইদুর রহমান। এদের পুলিশের হাতে ছেড়ে দিয়ে বইয়ের ব্যাপারে মন দিলেন তিনি। বইটা সম্ভবত সেই দার্শনিকদের হাতে। সুতরাং যে অভিযান তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন তা বাস্তবায়ন করার সময় এসে গেছে মনে হচ্ছে। এতে তার জীবনের ঝুঁকি আছে। কিন্তু তবুও পিছপা হবার উপায় নেই।

অত্যাধুনিক কিছু টেকনোলজি ব্যবহার করে দার্শনিকদের অবস্থান জানার চেষ্টা করে যাচ্ছে তার টেক-গোয়েন্দারা । অবস্থা এমন যে যেকোন সময় জানা যেতে পারে। সাইদুর রহমান তাই বাহিনী প্রস্তুত করে রেখেছে। চল্লিশজন সাহসী সদস্যের এক দল। অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। এবং এদের নেতৃত্বে থাকবেন তিনি নিজে।

এয়োদশ অধ্যায়

কৈলাশপুর গ্রামের সেই খুনগুলো নিয়ে পত্রিকায় লেখালেখি হচ্ছে। আবার আফসার উদ্দিনের খুনীরা ধরা পড়ার খবর ও গুরুত্বের সাথে পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু সাইদুর রহমানের এতে কোন আগ্রহ নেই। তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন তার নিয়োজিত কয়েকজন টেক-গোয়েন্দার কিছু সিগনালের জন্য। দার্শনিকদের অবস্থান গত তিনদিন ধরে এই শহরেই আছে। কয়েকবার অস্পষ্টভাবে কয়েকটা জায়গায় তাদের উপস্থিতি ধরা পড়েছে রাডারে। আশা করা যায় খুব শীঘ্রই স্পষ্টভাবে জানা যাবে।

সাইদুর রহমান নির্ঘুম অবস্থায় তার ঘরে পায়চারী করছেন। কলিংবেলের শব্দ হল। বাসার কাজের লোক জেগে ছিল। সে দরজা খোলে দিল। সাইদুর রহমান দেখলেন এক যুবক মাথা নিচু করে তার ড্রয়িং রুমে নিরীহ ভঙ্গিতে বসে আছে।

তিনি সামনে এগিয়ে যেতেই ছেলেটি উঠে দাঁড়াল। তিনি ছেলেটি চিনতে পারলেন। পকেটের পিস্তলে হাত দিতে যাবেন এমন সময় ছেলেটি বলে উঠল, "স্যার আমার কাছে কোন রিভলভার নেই। আমি আপনাকে কিছু কথা বলতে এসেছি। একটা তথ্য দিতে এসেছি।"

সাইদুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন, "তুমিই কৈলাশপুর গ্রামে এতগুলো খুন করেছ? ভল্ট ভেঙ্গে দুজন পুলিশ মেরে পালিয়েছ?"

"জ্বী স্যার। আমি করেছি। কারণ আপনারা আমার পরিবারের সদস্যদের খুনের বিচার করতে পারেননি। যারা আপনাদের চেয়ে আলাদা তাদের অধিকার আপনারা দিতে চান না। সুতরাং, বিচার আমাকেই করতে হল।"

সাইদুর রহমান বসলেন। তিনি বললেন, " দেখো তুমি যা ভাবছো তা কখনোই নয়। আমরা সবাইকে সমানভাবে দেখার চেষ্টা করি। তোমার পরিবারের সদস্যদের খুনের সময়ও পুলিশ তদন্ত করেছিল। কিন্তু যা বের হয়েছে তাতে কারো সংশ্লিষ্টতা তখন পাওয়া যায়নি। আরেকটা ব্যাপার, গ্রামের কেউ তখন তোমাদের পক্ষে কথা বলেনি।"

হাসিব হাসল। বলল, "ঠিকই বলেছেন স্যার। কারণ আমার পরিবার তাদের চেয়ে ভিন্ন ছিল। ভিন্নতা মানুষ পছন্দ করে না। রেসিজমের মূলে এটাই। গায়ের রঙে, বিশ্বাসে, জাতিগতভাবে সংখ্যালঘুদের নির্যাতনই সভ্যতা।"

"তুমি ভুল বলছ। ব্যাপারটা তা নয়।"

"স্যার, সংখ্যালঘু হবার কি যাতনা, সংখ্যালঘু না হলে কেউ বুঝতে পারবে না। আমার বাবার কথা মনে হলে নিকোলো ম্যাকায়াভেলীর কথাটা মনে পড়ে -

"Hence it is that all armed prophets have conquered and the unarmed ones have been destroyed."

"তোমার কাছ থেকে আমি ম্যাকায়াভেলী নিয়ে জ্ঞান লাভ করতে চাই না। আমার ধারণা তোমাকে দার্শনিকেরা তাদের ফাঁদে ফেলেছে। তুমি ওদের সাথে যোগ দিয়েছ?"

"জ্বী স্যার। তবে আমার কাজে আমি ওদের ব্যবহার করেছি মাত্র। ওদের সাথে যোগ দেইনি। ভল্ট ভেঙ্গে ফাইলপত্র নিতে ওদের কিছু প্রযুক্তির সাহায্য নিয়েছি। কিন্তু ওদের ধ্বংস চাই আমি। তাই আজ এসেছি আপনার কাছে একটা তথ্য দিতে।"

"কী তথ্য?"

"কাল সকাল ছয়টায় ওদের প্রায় সব বড় নেতারা মিলিত হবে সিটিগেইটের দক্ষিণ পাশের পুরনো বিল্ডিং, যেটাতে কাজ চলছে সেখানে।"

"তোমার কথা বিশ্বাস করব কেন?"

"স্যার, মিথ্যা বলার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমি আপনার কাছে আসতাম না। তবে আপনি আমাকে গ্রেফতার করার চেষ্টা এখন করবেন না। আমি তৈরী হয়েই এসেছি। আমাকে ধরতে এলে বা গুলি করলে আমার সাথে এই পুরো বিল্ডিংটাই উড়ে যাবে।"

সাইদুর রহমান পকেটে হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু পিস্তল হাতে নিলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কাদের জন্য কাজ করছে?"

হাসিব উঠে দাঁড়িয়ে বলল, " কারো জন্য না স্যার। নিজের জন্য। জার্মান দার্শনিক ফিখটে বলেছিলেন আই ইজ ইকুয়েলটু আই। আমিও সেরকম।"

সে চলে যেতে শুরু করলে সাইদুর রহমান পিস্তল বের করলেন। তার পিঠের দিকে পিস্তল তাক করলেন। কিন্তু গুলি করলেন না। হাসিব দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

তিনি দরজায় এসে দেখলেন হাসিব গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। দাড়োয়ান বেশ ঘুম ঘুম চোখে গেট খুলে দিচ্ছে।

সাইদুর রহমান ফোন দিলেন পুলিশের বিশেষ ব্রাঞ্চের অফিসার মুহিবকে। বললেন, "হাসিব ছেলেটা এসেছিল আমার কাছে। সে রোড সি ব্লক টু ধরে যাচ্ছে। দশ মিনিটের মধ্যে অন্যদিক থেকে আসলে তাকে পেয়ে যাবে।"

তিনি ঘড়িতে দেখলেন বাজে সাড়ে পাঁচটা। অর্থাৎ ছয়টা বাজতে আর আধঘন্টা বাকি। তিনি তার অভিযানের জন্য তৈরীকৃত চল্লিশ জন সদস্যের টিমকে ফোন দিলেন। নিজে তৈরী হয়ে গেলেন অফিসে। সেখান থেকে সংক্ষিপ্ত একটা ব্রিফ দিয়ে চললেন সিটিগেইটের দিকে। ঘড়িতে তখন ছয়টা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি।

সব সদস্যরা সিটিগেইটের পাশের সেই নতুন করে নির্মানাধীন পুরনো বিল্ডিং এর চারপাশে পজিশন নিলেন। সাইদুর রহমান কিছুটা অনিশ্চয়তায় ছিলেন। হাসিব ছেলেটার কথায় এখানে আসা ঠিক হল কি না। কিন্তু প্রায় ঠিক তখন তার টেক-গোয়েন্দারা নিশ্চিত করেন সত্যিই এই বিল্ডিং এ দার্শনিকদের গ্রুপ আছে। সম্ভবত তাদের গুরুত্বপূর্ণ মিটিং চলছে।

সাইদুর রহমান পাশের একটি বিল্ডিং এ পজিশন নিয়ে রাইফেল তাক করে প্রথম যে মুখটি দেখলেন ঘরের ভিতরে সে হল সক্রেটিস। তার চারপাশে গোল হয়ে বসা আরো দশ বারো জন্য। সবার মাথা বরাবর নিখুঁত নিশানা করা হল বিভিন্ন দিক থেকে। এখন শুধু সাইদুর রহমান একটি সিগন্যাল দিবেন। সাথে সাথে গর্জে উঠবে প্রশিক্ষিত সদস্যদের হাতের আগ্নেয়াস্ত্র।

সাইদুর রহমান ঘড়িতে দেখলেন ছয়টা সাত মিনিট।

তিনি শেষ পর্যায়ে এসে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতে শুরু করলেন। এদের হত্যা করলে হয়তো তার জেল হবে। কিন্তু নির্মূল হবে এক সন্ত্রাসীদের দল। সাইদুর ট্রিগারে হাত দিলেন। আর ঠিক তখনি তার ফোন বেজে উঠল।

স্ক্রিনে ডিপার্টমেন্ট প্রধান সবুর খানের নাম।

সাইদুর রহমান ফোন রিসিভ করলেন।

"হ্যালো স্যার"

"সাইদুর, আপনি কোথায়? এক্ষুনি থানায় চলে আসুন। খুব জরুরী।"

"কিন্তু স্যার, আমি একটি ঝামেলায় আছি।"

"কি ঝামেলা?"

"স্যার, একটা মিশনে।"

"আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে চলে আসুন। এটি প্রেসিডেন্টের নির্দেশ। দেশের জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সব বিভাগের প্রধানদের নিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ মিটিং হবে।"

সাইদুর রহমান মরিয়া হয়ে বললেন, "কিন্তু স্যার, আমি আপনাকে অনেকবার যাদের কথা বলেছিলাম, সেই দার্শনিকদের আমি আজ হাতের মুঠোয় পেয়েছি। আজ এদের শেষ না করতে পারলে হয়তো আর কোনদিন এরকম সুযোগ পাওয়া যাবে না।"

গাঢ় স্বরে সবুর খান বললেন, "আপনি এখনি মিশন বন্ধ করে চলে আসুন। আপনি কি এতবড় অভিযানের আগে আমার অনুমতি নিয়েছেন? এছাড়া কাউকে শেষ করে দেয়া আপনার কাজ না। যাইহোক, এদের ব্যাপারেই আজ মিটিং হবে। আপনি চলে আসুন।"

সাইদুর রহমান তীব্র আক্রোশে রাইফেল আকাশের দিকে উঁচিয়ে এলোপাথারি কিছু গুলি ছুঁড়লেন। সব বিশেষ বাহিনীর সদস্য অবাক হয়ে গেল তার এই আচরণে। আশপাশের বাড়িঘরের মানুষের সকালের ঘুম ভেঙ্গে গেল গুলির শব্দে।

চতুর্দশ অধ্যায়

মিটিং শুরু হয়েছে। সবুর খানসহ সব বিভাগীয় পুলিশ ডিপার্টমেন্টের প্রধান এসেছেন। সাইদুর রহমান মুখ গম্ভীর করে বসে আছেন।

সবুর খান বললেন, "এক গুরুত্বপূর্ণ কারণে আজ সমবেত হয়েছি। যে সন্ত্রাসী সংগঠনের অস্তিত্বের ব্যাপারে আমরা কয়েকবছর ধরে সন্দেহ করে আসছিলাম তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই সংগঠন সারাদেশব্যাপী তাদের কার্যক্রম চালনা করছে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে। আমাদের বিভিন্ন কর্মকর্তা এদের ব্যাপারে বিভিন্ন সময় রিপোর্ট করেছিলেন। কিন্তু নিশ্চিত হতে আমাদের সামান্য সময় লেগেছে। সাইদুর রহমান অনেক আগে থেকেই আমাকে এদের সম্পর্কে বলে আসছিলেন। সাইদুর রহমান আপনি কিছু বলুন?"

সাইদুর রহমান গম্ভীরভাবে বললেন, "আমি তো অনেক আগে থেকেই বলে আসছি।"

সবুর খান বললেন, "কিন্তু মজার ব্যাপার হল প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা আপনাকেই ওদের এজেন্ট বলে ধরে নিয়েছিল। তাই আপনার কথা অনেক ক্ষেত্রেই নিতে চাইনি। আপনাকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল কিছুদিন।

কিন্তু ওদের সাথে সংশ্লিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়নি। উপরন্তু ওদের বিরুদ্ধে আপনার বিভিন্ন কার্যক্রম আমাদের চোখে পড়েছে।"

সাইদুর রহমান অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে তাঁকিয়ে রইলেন। তাকেই কিনা ভাবা হয় এজেন্ট!

সবুর খান বলতে লাগলেন, "তাই আমরা এই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত যে বাহিনী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাতে নেতৃত্ব দিবেন আপনি। আপনাকে বৃথা কিছুদিন সন্দেহ করার জন্য সমস্ত ডিপার্টমেন্ট লজ্জিত। আশা করছি আপনি কিছু মনে করবেন না। কারণ আইন শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে অনেক কিছুই আমাদের করতে হয়।"

সাইদুর রহমান তেমন কিছু মনে করেননি। কারণ তাকে সন্দেহ করার বেশ কিছু কারণও ছিল। কারণ তিনিই ব্যাপারটা নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন।

সবুর খান সাইদুর রহমানের নোটবুকে লেখা এদের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য, ডায়াগ্রাম সবাইকে দেখালেন।

তারপর বললেন, "সাইদুর আপনিই এদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন। কিন্তু একটা জায়গায় আমি আপনাকে হারিয়ে দিয়েছি অন্তত। আপনি কি জানেন এদের নাম কি?"

সাইদুর রহমান বললেন, "সেরকমভাবে কোন নামের কথা শুনিনি।"

সবুর খান হাসিমুখে বললেন, "গ্যাডফ্লাই। এদের সংগঠনের নাম। বিভিন্ন গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আমরা নিশ্চিত হয়েছি। তাছাড়া আমরা আরো কিছু তথ্য পেয়েছি যা আপনার এখানে নেই। ডিপার্টমেন্টের গোয়েন্দাদের তথ্য এবং আপনার তথ্য দুই মিলিয়ে এদের সম্পর্কে বেশ স্পষ্ট একটা ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে।"

মিটিং শেষ হল। সাইদুর রহমান মুখ গম্ভীর করে রইলেন পুরোটা সময়। মিটিং শেষে সবুর খান তাকে ডেকে নিয়ে বললেন, "শোন সাইদুর, আমার বিশ্বাস তুমিই এদের ধ্বংস করতে পারবে। মন খারাপ করো না। আজ যেখানে গিয়েছিলে ওটা একটা ট্র্যাপ ছিল। আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত।"

সাইদুর রহমান দ্বিধাগ্রস্ত চোখে সবুর খানের দিকে তাকালেন। তিনি বুঝতে পারলেন না কথাটা বিশ্বাস করবেন নাকি করবেন না।

সাইদুর রহমান আরেকটি খবর পেলেন। রোড টু ব্লক সিতে একটা লাশ পাওয়া গেছে। পুলিশ বলছে এটা বিশেষ বাহিনীর সদস্য হাসিবের লাশ। একটা ট্রাক চলে গেছে মাথার উপর দিয়ে। ট্রাকটিতে দাহ্য পদার্থ ছিল। দূর্ঘটনায় আগুন ধরে গিয়েছিল তাতে। ফলশ্রুতিতে লাশের মুখটি চেনার কোন উপায় নেই।

সাইদুর রহমান মেজর রফিকের কাছ থেকে ফোন পেলেন। মেজর রফিক জানালেন বিজিবি নিশ্চিত হয়েছে উজান ফকির শহরের সবচেয়ে বড় ইয়াবা ব্যবসায়ী। মিয়ানমার থেকে প্রতিমাসে বেশ কয়েকটি বড় চালান আসে তার কাছে। মিয়ানমার সীমান্তে তার কাছে আসা বেশ ক'টি মাদক দ্রব্যের চালান ধরা পড়েছে বিজিবির হাতে।

দুপুরের দিকে পুলিশের কিছু সদস্য এসে সাইদুর রহমানকে ধরে নিয়ে গেল। কৈলাশপুর গ্রামে যেসব মানুষ খুন হয়েছেন তাদের শরীরে বিশেষ বাহিনীর ব্যবহার করা গুলি পাওয়া গেছে। এই বাহিনী সাইদুর রহমান তৈরী করেছিলেন এবং তিনি এর প্রধান। এক মানবাধিকার সংস্থা মামলা করেছে । সুতরাং তাকে জেলে যেতে হল। হাসিব যে এই কাজ করেছে তা প্রমাণ করা যাবে কিন্তু এর আগে তাকে কিছুদিন জেলেই থাকতে হবে।

সাইদুর রহমানের সাথে জেলে দেখা করতে এল উজান ফকির। তাকে পুলিশ ইয়াবা ব্যবসায়ী হিসেবে চিনে না। সম্ভবত এই তথ্য এখনো থানায় দেয়া হয়নি। তবুও পুলিশ ভিতরে আসতে দিচ্ছিল না। সে বলল, "স্যার আমাকে ভিতরে যাইতে দ্যান।" পুলিশ অফিসার তাকে কর্কশ ভাষায় নিষেধ করল। তখন উজান ফকির জিজ্ঞেস করলো, "স্যার আপনার নাম তো মুশতাক, আপনের বাপের নাম কি?"

পুলিশ রাগে চোখ বড় বড় করে তাকায়।

উজান ফকির অমায়িক ভঙ্গিতে বলে, "না মানে একটু দরকার আছিল।"

পুলিশ অফিসার জিজ্ঞেস করে, "কি দরকার?"

উজান ফকির নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, "আপনাকে একটা চড় দিয়া আবার বাপের নাম জিজ্ঞেস করতাম। আমি নিশ্চিত আপনে কইতে পারবেন না তখন।"

এরপরই ঝামেলার শুরু হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত উজান ফকির ভিতরে সাইদুর রহমানের সাথে দেখা করতে সক্ষম হয়। সে সাইদুর রহমানের সামনে গিয়ে মলিন

মুখ করে বলে, "স্যার, এই নেন আপনার ব্রোঞ্জের মাথা! এই মাথার কথাও বুঝি না, হাবিজাবি।"

সাইদুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন, "এটি আপনি কোথায় পেলেন?"

উজান ফকির সামান্য হেসে বলল, "গায়েবী পদ্ধতিতে। বলা নিষেধ।"

সাইদুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি নাকি মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত?"

উজান ফকির অমায়িক ভঙ্গিতে হাসল।

তারপর কিছুটা গম্ভীর হয়ে বলল, "স্যার, সে যাইহোক, আজ আমি আপনাকে এই ব্রোঞ্জের খুলিটা দিতে আইলাম। এটা যে কারণে দেশে নিয়া আসছিলাম তা করা সম্ভব না। এরে কথা বলাইতে হলে যে জিনিস দরকার তা এমন কিছু লোকের হাতে যাদের কাছ থেকে আমার পক্ষে আনা সম্ভব না। আপনি হয়তো পারবেন। তাই আপনাকে দিয়ে গেলাম "

ফকির আর কিছু না বলে ধন্যবাদের অপেক্ষা না করেই ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। বিশেষজ্ঞ দল পরীক্ষা করে নিশ্চিত হল এটাই সেই মায়াদের উপাসনার কাজে ব্যবহৃত প্রাচীন ব্রোঞ্জের মাথা। এই ব্রোঞ্জ করোটি প্রাপ্তির খবর দেশ বিদেশের পত্রিকায় ফলাও করে প্রচারিত হল।

জামিন পাওয়ার আগে জেলে সাইদুর রহমান একটি চিঠি পেলেন। তা নিম্নরূপঃ

সাইদুর রহমান,

কেমন আছেন? আশা করি আপনি জেলে ভালোই আছেন। আমাদের জেলে ভরতে গিয়ে আপনি জেলে ঢুকে গেলেন। এম্টি ট্যাংক ডগের মত হয়ে গেল না ব্যাপারটা?

আমরা আপনার কাছে একরকম পরাজিত হয়েছি। আপনি এত কাছাকাছি চলে আসবেন আমরা ভাবতে পারিনি। সেখানে আমরা ছিলাম কি ছিলাম না, সেটা একটা ট্র্যাপ ছিলো কি ছিলো না, সে ধাঁধা আমরা ভাঙবো না। জীবনের সব ধাঁধার অর্থ পরিষ্কার হয়ে গেলে জীবনযাপন অর্থহীন হয়ে পড়ত।

ধাঁধার কথা যখন উঠল আরেকটা ধাঁধা আপনাকে জানিয়ে রাখি, রোড টু ব্লক সিতে যে ছেলেটা মারা গেল, সে কি হাসিব ছিলো, না ছিলো না?

আর প্রাচীন মায়াদের বই নিয়ে দুশ্চিন্তা আপনার কোন দুশ্চিন্তা করতে হবে না। বই সঠিক জায়গাতেই আছে।

আমাদের নাম এখন সবাই জেনে গেছে। আপনি নিশ্চয়ই আমাদের বিরুদ্ধে নতুন অভিযানে নামবেন। আমরা এর অপেক্ষায় রইলাম।

আমাদের নাম "গ্যাডফ্লাই"। সক্রেটিস ছিলেন গ্যাডফ্লাই অব এথেন্স। তার প্রশ্নে যে সাবজেক্টিভ চিন্তার শুরু এর গুরুত্ব দর্শনের জগতে অনেক। সেই গুরুত্বের কথা স্মরণে রেখে আপনাকে একটা বিব্রতকর প্রশ্ন করে আমাদের এই পত্র শেষ করতে চাই।

"কি করে পৃথিবীতে প্রথম কিছু মানুষের কাছে অর্থ জমা হতে শুরু করলো আর কিছু মানুষ নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়ে শ্রমিকে পরিণত হল? কি করে সেই প্রথম সম্পদশালীদের অর্থ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে এবং কিছু লোক শ্রম নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে?"

বলে রাখছি, এই বিব্রতকর প্রশ্নের দুটো উত্তর হতে পারে। একটি বলা যায় প্রচলিত গালগল্প। নীরস বালখিল্যতা। আরেকটি বাস্তব নির্মম সত্য।

গালগল্পটা হল,

বহু বহুকাল পূর্বে পৃথিবীতে দুই ধরনের লোক ছিল। একদল পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান, মিতব্যয়ী। আরেকদল অলস এবং উদ্দাম জীবন যাপনে উড়িয়ে দিত নিজেদের সম্পদ। ফলশ্রুতিতে প্রথম দল অর্থ সঞ্চয় করল আর দ্বিতীয় দলের কিছুই রইল না। তারা পরিণত হল নিঃস্ব শ্রমিকে।

এই প্রচলিত গালগল্প ছাড়াও যে আরেকটি সত্য উত্তর আছে, আপনি জেলে বসে সে উত্তর খুঁজতে থাকুন।

সে উত্তর নিয়ে আলাপ হবে অন্যকোথাও, অন্যকোনখানে।

ধন্যবাদ

গ্যাডফ্লাই

[সমাপ্ত]

লেখক পরিচিতি

জন্ম সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জ জেলায় জগন্নাথপুর উপজেলায়। তার প্রথম গল্পসংকলন "মার্চ করে চলে যাওয়া একদল কাঠবিড়ালী" প্রকাশিত হয় ২০১৪ কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় সৃষ্টিসুখ প্রকাশন থেকে। তার লেখা প্রথম মৌলিক থ্রিলার "কাফকা ক্লাব" ও প্রথম উপন্যাস "রাধারমন এবং কিছু বিভ্রান্তি " প্রকাশিত হয় ২০১৫ বইমেলায়, আদী প্রকাশন থেকে।